বিশেষ সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২০ ▪ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

হবে হবে প্রভাত হবে আঁধার যাবে কেটে

সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে ‘আরেক বাংলাদেশে’র গল্পকথা

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২৩ বছর: পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস

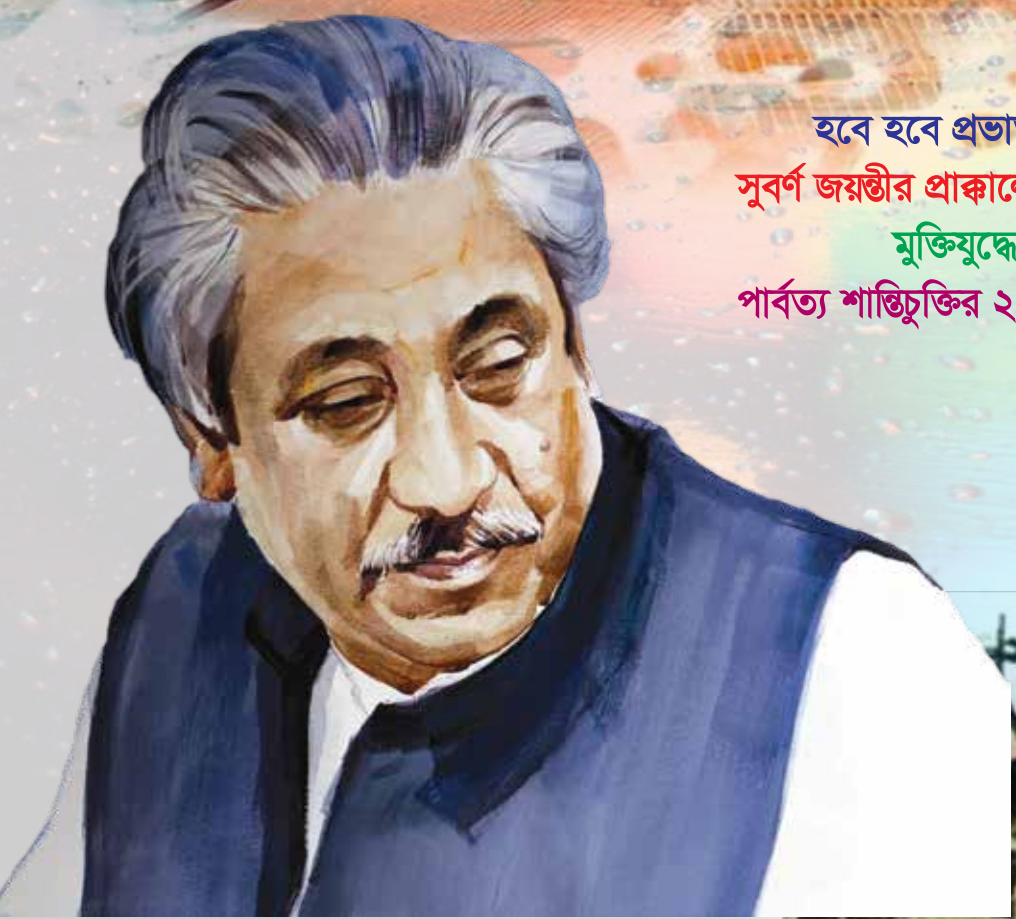

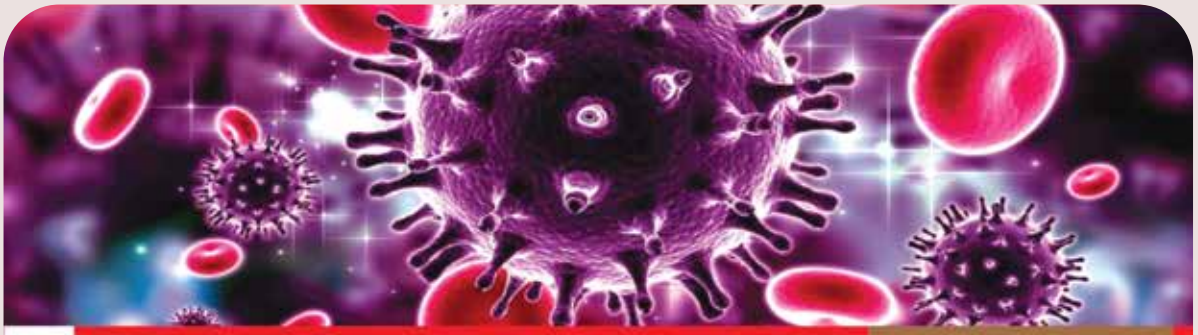

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ডিসেম্বর ২০২০ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৭

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক: স্বাধীনতা স্তম্ভ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা

সম্পাদকীয়

ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি অবিস্মরণীয় গুরুত্ববহ দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনেই অর্জিত হয়েছিল দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির বিজয়। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সেই দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় 'বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। মহান বিজয় দিবসে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করছি– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অকুতোভয় লাখো শহিদ, বুদ্ধিজীবী ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। একইসঙ্গে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে বাংলাদেশের রয়েছে অনেক গৌরবময় প্রাপ্তি ও ঈর্ষণীয় সাফল্য। বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় দিবস ও উন্নয়ন নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প ও কবিতা দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ* সংখ্যা।

নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ৯ই ডিসেম্বর। সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও অগ্রণী ভাবনার সারথি হিসেবে তিনি সমাজের উন্নয়নে অদম্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় কৃষি ও কৃষক উন্নয়নও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেগম রোকেয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নসহ নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে ব্যাপৃত। এ নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ।

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। ঋতুবৈচিত্র্যে শীতের রয়েছে বিশিষ্ট স্থান। এটি ঝরাপাতার দীর্ঘশ্বাসে বিষণ্ন শীতের ঋতু শুধু নয়, বরং সোনার ধানে আঙিনা ভরার ঋতু। এর আগমনে গ্রামবাংলা আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। এ ঋতুতে পাওয়া যায় নানান রকম পিঠা ও পায়েস। এ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

এছাড়া এ সংখ্যাটিতে রয়েছে– অন্যান্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ পালনকালে মহান বিজয় দিবসে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করি, এ সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ হুমায়ুন কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ

হবে হবে প্রভাত হবে আঁধার যাবে কেটে ৪
প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে 'আরেক বাংলাদেশে'র গল্পকথা ৭
প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ১০
প্রফেসর ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ: আমাদের মিত্ররা ১৩
খালেক বিন জয়েনউদদীন

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ১৬
ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

মুজিব জন্মশতবর্ষ: জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন ২০
মুহ: সাইফুল্লাহ

১৯৭১-এর অক্টোবর-নভেম্বরে রণাঙ্গন বুলেটিনে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় বার্তা ২২
ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সম্যান্ট ২৪
সুফিয়া বেগম

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজভাবনা ২৫
শাফিকুর রাহী

করোনাকালেও জনশক্তি রপ্তানি খাতে নতুন রেকর্ড ২৭
এম এ খালেক

মুজিববর্ষের আলোকে বিজয় দিবসের তাৎপর্য ২৯
মিলন সব্যসাচী

পাবনায় প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ ৩১
আমিরুল ইসলাম রাঙা

বেগম রোকেয়া: ইতিবাচক ভাবনার সারথি ৩৬
প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম

কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ ৩৮
প্রত্যয় জসীম

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২৩ বছর: পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস ৪১
রেহানা শাহনাজ

একটি মুজিবীয় দিন ৪৩
মনজুর-ই-আলম ফিরোজী

শীতের রূপবৈচিত্র্য ৪৫
মোশারফ হোসেন

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় যুব দিবস ৪৭
মো. মুশিউর রহমান

সরকারের এইডস কর্মসূচি ও চলমান কার্যক্রম ৫০
মারিয়ম ফারিহা

দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন ৫১
মো. এনামুল হক

বিদ্যুতায়নে সরকারের সাফল্য ৫২
রূপায়ণ বিশ্বাস

হাইলাইটস

গল্প

দেখার ভুবন ৩৩
সেলিনা হোসেন

যুদ্ধযাত্রা ৫৪
রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯
মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ, অমিত রেজা, সোহরাব পাশা, সাঈদ তপু, মিয়াজান কবীর, সুজিত হালদার, রোকসানা গুলশান, গোপেশচন্দ্র সূত্রধর, আবুল কালাম আজাদ, রুহুল গনি জ্যোতি, খান চমন-ই-এলাহি, বশিরুজ্জামান বশির, মোহাম্মদ ইলইয়াছ, মো. আসাদুজ্জামান সরকার, শাহনাজ, ইমরান পরশ, জাফরুল আহসান, আখতারুল ইসলাম, এম এস ইসলাম, মিজানুর রহমান মিথুন, সাবিত্রী রানী, মিশরাত সরকার মুক্তি, ফায়েজা খানম, শাহরিয়ার নূরী, রাবেয়া নূর, গোবিন্দলাল সরকার, রুস্তম আলী, ম. মীজানুর রহমান, হাসান আলী, এস. এম. মাসুদ

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬০
প্রধানমন্ত্রী ৬১
তথ্যমন্ত্রী ৬২
জাতীয় ঘটনা ৬৩
আন্তর্জাতিক ৬৪
উন্নয়ন ৬৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬৫
শিল্প-বাণিজ্য ৬৬
শিক্ষা ৬৬
বিনিয়োগ ৬৭
নারী ৬৭
সামাজিক নিরাপত্তা ৬৮
কৃষি ৬৮
বিদ্যুৎ ৬৮
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬৯
নিরাপদ সড়ক ৬৯
স্বাস্থ্যকথা ৭০
কর্মসংস্থান ৭১
যোগাযোগ ৭১
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৭২
চলচ্চিত্র ৭৩
সংস্কৃতি ৭৪
মাদক প্রতিরোধ ৭৪
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৫
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৬
প্রতিবন্ধী ৭৭
ক্রীড়া ৭৮
চলে গেলেন অভিনেতা, নির্দেশক আলী যাকের ৮০
আফরোজা রুমা

হবে হবে প্রভাত হবে আঁধার যাবে কেটে

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকথা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থটি পাঠ করলে এর প্রতিটি ছত্র আমাদের অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করে। পাকিস্তান আমলে বাঙালি বিদ্বেষ ও বাঙালি জাতিকে পদাবনত করে রাখার সকল অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র বঙ্গবন্ধু তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন সুনিপুণভাবে। এ গ্রন্থটি শুধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস হিসেবে নয়, সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* নিয়ে 'হবে হবে প্রভাত হবে আঁধার যাবে কেটে' শীর্ষক বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে 'আরেক বাংলাদেশে'র গল্পকথা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন আর স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরপূর্তি উদ্‌যাপনে ব্যাপৃত বাঙালি জাতি। বঙ্গবন্ধু যেমন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে সেই পথেই হাঁটছে আমাদের দেশ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অসাধ্য সাধন করেছে। অর্থনীতির প্রতিটি সূচকেই বাংলাদেশ নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেছে। এ বিষয়ে 'সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে আরেক বাংলাদেশের গল্পকথা' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৭

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

বাংলাদেশের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি পর্বে বুদ্ধিজীবীদের অবদান অবিস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। বাংলাদেশকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই এ হত্যাকাণ্ড। এঁদের হারিয়ে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তবে স্বাধীন বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবীদের উপদেশ ও সহযোগিতায় এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ বিষয়ে 'মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড' শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-১০

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২৩ বছর: পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে রাষ্ট্রের পক্ষে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যা পার্বত্য শান্তিচুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির ফলে পার্বত্য অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলের অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২৩ বছর: পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৪১

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৭১৯৪৭২০, ই-মেইল: rupaprinting@gmail.com

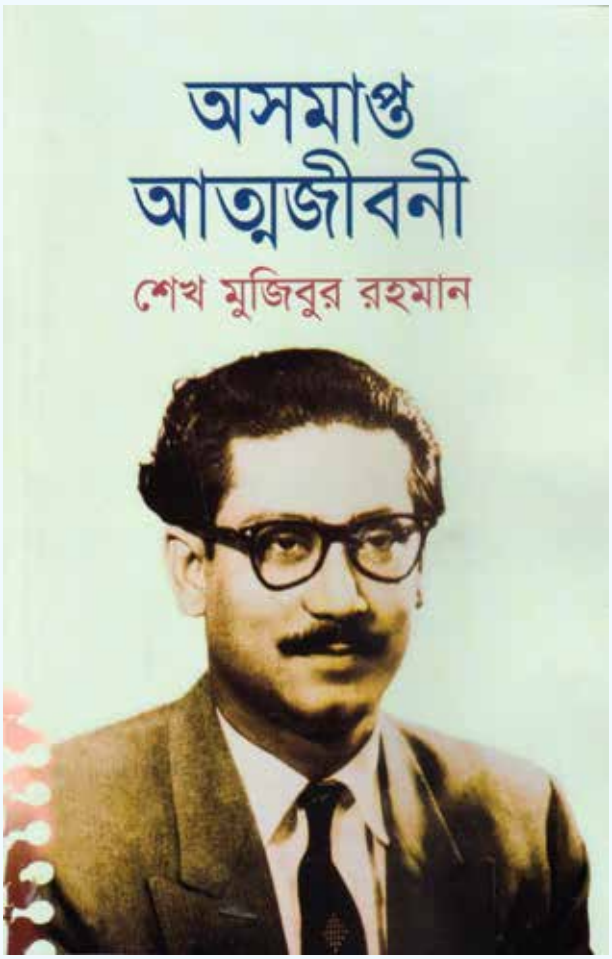

হবে হবে প্রভাত হবে আঁধার যাবে কেটে

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকথা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থটি পাঠ করলে ২৮৮ পৃষ্ঠার এই বইয়ের প্রতিটি ছত্র আমাদের অনুপ্রাণিত করে, উৎসাহিত করে, উদ্দীপ্ত করে। পাকিস্তানের সেই ঔপনিবেশিক আমলের বাঙালি বিদ্বেষ ও বাঙালি জাতিকে পদাবনত করে রাখার সকল অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র বঙ্গবন্ধু যে নৈপুণ্যের সাথে লিখেছেন তা পাঠ করলে চোখে পানি ধরে রাখা অসম্ভব। আবার একইসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী ও প্রাঞ্জল বর্ণনার কারণে পাঠক হয়ে উঠে সঞ্জীবিত ও দৃঢ়চিত্ত। আমাদের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার পঙ্‌ক্তি– 'হবে হবে প্রভাত হবে, আঁধার যাবে কেটে' বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শনের যথাযথ প্রতিফলন। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে নয়া দিল্লিতে যাত্রাবিরতির সময় ভারতীয় সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ আজ অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে।

বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* স্মৃতিগ্রন্থ আমাদের নতুন প্রজন্মকে মূলত পরিণত-মনস্ক ও আলোকিত প্রজন্মে রূপান্তর করবে বলে আমি মনে করি। গ্রন্থটি সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-কে আমি তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ কেন বলছি তার অনেকগুলো কারণ আছে। এই অনেকগুলো কারণকে প্রধান দুটি কারণের মধ্যেও আবার সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব। এর প্রথমটি হলো– এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠার ইতিহাসটি যত প্রাণবন্ত ও সুস্পষ্টভাবে পাই তা আর কোনো বইয়ে পাই না। আর তা সম্ভবও নয়, কারণ স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর স্বহস্তে লিখিত দিনলিপি এই গ্রন্থের উৎস।

১৯৩৯ সালে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে যোগদান থেকে ১৯৫৫-তে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়া পর্যন্ত ১৭ বছরের একটি নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস এ গ্রন্থে আছে। গোপালগঞ্জের মতো একটি মহকুমা শহরে ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ নেতা-কর্মী থেকে তিনি এসময় পর্বে হয়ে উঠলেন একজন জাতীয় নেতা। এবং এর পরবর্তী ১৬ বছরে তিনি একটি জাতির মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতির অবিসংবাদিত নেতা ও পরিণামে জাতির জাতির পিতা হিসেবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। কোন গুণে কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর এই উল্কাসম উত্থান বা অধিষ্ঠান তার ব্যাখ্যা এবং চিত্র আমরা এই ১৭ বছরের ইতিহাসের মধ্যে পাই। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর এই বর্ণনা আমাদের ইতিহাসের স্বর্ণখনি।

দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে যদি সংক্ষিপ্তভাবে বলি তা হলো– এ বইটি শুধু তাঁর ব্যক্তিজীবন বা ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, ওই ১৭ বছরের কালপর্বের সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দলিল হয়ে উঠেছে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ এই কালপর্বটি শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসেরও এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের একটি পশ্চাৎপদ অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন ও ৮ বছর ধরে সেই দাবি বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম আন্দোলন শেষে ১৯৪৭ সালে তা আদায়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে এক নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে। আবার এর পরবর্তী ৮ বছরে আদায়কৃত রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের অগণতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আরেক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে আরেক বাস্তবতার মুখোমুখি আমরা হই। বঙ্গবন্ধু এই পুরো রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যমণি হয়ে এর কেন্দ্রে অবস্থান করায় তাঁর আত্মজীবনীসূত্রে আমরা এ কালের রাজনীতির একটি প্রকৃত ব্যাখ্যা সংবলিত স্বচ্ছচিত্র এখানে পাই। এ দুই প্রধান কারণে বিস্তৃত বিশ্লেষণে অগ্রসর হলে আমরা এ গ্রন্থের তাৎপর্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

বঙ্গবন্ধুর জীবনবৈশিষ্ট্যের যে দিকটা আমাদের প্রথমেই আকৃষ্ট করে তা হলো, দরিদ্র মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা। স্কুল জীবনে একজন আদর্শ শিক্ষকের এমন সেবাকার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমশ তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং একটি নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মুক্তির সংগ্রামে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই সূত্রেই তাঁর মনে যে দেশপ্রেম অঙ্কুরিত হয় তা তাঁর জীবনের সকল স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাসহ সমগ্র জীবনাদর্শেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে স্মরণীয় বঙ্গবন্ধুর দুটি উক্তি। এর একটি

তিনি করেছেন ১৯৪৯ সালের জুনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পরপর; কারামুক্তির পরে বাড়ি গেলে তাঁর বাবা যখন জানতে পারেন তিনি আর আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে আগ্রহী নন তখন তাঁকে বিলেতে গিয়ে বার এট ল' করার বিকল্প প্রস্তাব দিলে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এখন বিলেত গিয়ে কী হবে, অর্থ উপার্জন আমি করতে পারব না।' বঙ্গবন্ধুর তখনকার উপলব্ধি:

> আমার ভীষণ জেদ হয়েছে মুসলিম লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন দেখি তার উলটা হয়েছে। এর একটা পরিবর্তন দরকার। জনগণ আমাদের জানত এবং আমাদের কাছেই প্রশ্ন করত। স্বাধীন হয়েছে দেশ, তবু মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে না কেন? (পৃ. ১২৫-১২৬)।

মানুষের অর্থাৎ দেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট লাঘবের কথা ভেবেই তিনি ব্যক্তিগত সুখ-স্বার্থের বিষয়টি জলাঞ্জলি দেন। দ্বিতীয় উক্তিতে তারই প্রতিফলন। কয়েকদিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন পুত্র-কন্যার সান্নিধ্যে সংসারের প্রতি মায়া অনুভব করেছিলেন, তাই তা ছিন্ন করায় যুক্তি:

> ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটু বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবুও তো যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়া মায়া করে লাভ কি? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে (পৃ. ১৬৪)।

শুরুতেই তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো, যত বাধাই আসুক যে-কোনো মূল্যে ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান করা। প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখ থেকেও ন্যায়সংগত লড়াইয়ে পিছু না-হটাই ছিল তাঁর একান্ত বৈশিষ্ট্য। সত্য উচ্চারণে তিনি সবসময়ই ছিলেন নির্দ্বিধ, অকুতোভয়। হোক তিনি দলের নেতা কিংবা দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রভুত ক্ষমতাবান ব্যক্তি– তার সামনে, মুখের ওপর, ন্যায়সংগত কথা বলতে তিনি কখনো ভীত হননি, সংকোচ বোধ করেননি। জেল-জুলুম-নির্যাতন কোনো কিছুকেই পরোয়া করেননি, এমনকি ভয় করেননি মৃত্যুকেও। ফলে তিনি দেশবাসীর কল্যাণের প্রশ্নে হতে পেরেছিলেন এমন আপোশহীন। কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীর অবজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে তাঁর বাড়ি থেকে চলে এসেছেন, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় মুসলিম-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, কলকাতা ও পরবর্তীকালে ঢাকা উভয় স্থানে দাঙ্গার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন, আদমজীতে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গারোধেও পালন করেছেন সাহসী ভূমিকা, শেরেবাংলা-সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী তিন জনকেই তিনি শ্রদ্ধা করেছেন আবার তাঁরা যখন ভুল করেছেন কিংবা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছেন তখন সরাসরি তার সমালোচনা করেছেন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ও মোহাম্মদ আলীর মুখের ওপর তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেননি। এসবই তাঁর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ মানবকল্যাণমুখী জীবনাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রন্থে বিধৃত ঘটনাবলি থেকে আমরা তাঁর চরিত্রের এসব অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

তাঁর জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সমান্তরালভাবেই অগ্রসর হয়েছে এদেশের গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনৈতিক ঘটনাধারা। ১৯৩৯ সালে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হলেন আর তার পরের বছরই পাস হলো ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। তারপর ১৯৪৭ পর্যন্ত কলকাতার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে অবস্থান করে সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে একটানা ছাত্র ও জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে একালের ইতিহাসের ভাঙাগড়ার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হয়ে রইলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন, দেখেছেন তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা আর সাতচল্লিশের ঐতিহাসিক পরিবর্তন। বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য:

১. ১৯৪১: তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে নজর নাই। শুধু মুসলিম লীগ, আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই। খবরের কাগজ *আজাদ* যা লেখে তাই সত্য বলে মনে হয়। (পৃ. ১৫)

২. ১৯৪৩: এই সময় থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে দুইটা দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটা প্রগতিবাদী দল, আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল। শহীদ (সোহরাওয়ার্দী) সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই, জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাই। (পৃ. ১৭)

এই যে একদিকে জমিদার, জোতদার আর খান বাহাদুর নবাবদের অভিজাত শ্রেণি, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত-দরিদ্রদের অনভিজাত গোষ্ঠী– এদের সকলেই তখন মুসলিম লীগের পতাকাতলে পারস্পরিক শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব নিয়েই ঐক্যবদ্ধ। ১৯৪৭-এ বাংলা ভাগের প্রশ্নে এই বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৭-উত্তরকালে দ্বন্দ্বটি প্রকট আকার ধারণ করলে শেষোক্ত অংশ উচ্চবর্গকে প্রত্যাখ্যান করে দলকে জনগণের প্রকৃত দলে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেয় এবং জনগণের (আওয়ামী) দল গঠন করে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৪৩ সাল থেকেই দলের এই শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই সচেতনতার পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে বর্তমান। আরেকটি কথা এখানে স্মরণীয় যে, এ গ্রন্থ পড়তে পড়তে ওই কালের রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে অনেক প্রচলিত 'সত্য' ধারণা বরবাদ হয়ে যায়। যেমন, ছেচল্লিশের দাঙ্গা সম্পর্কিত ধারণা। মুসলিম লীগকেই এজন্য মূলত দায়ী করা হয়। অথচ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে যে বিবরণ আমরা পাই তা ভিন্ন সত্য উদ্‌ঘাটন করে। বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য:

> কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিতে শুরু করলেন। ... ফরোয়ার্ড ব্লকের কিছু নেতা আমাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি শুনে মুসলিম লীগ অফিসে এলেন এবং এই দিনটা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে পালন করা যায় তার প্রস্তাব দিলেন। আমরা রাজি হলাম। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রপাগান্ডার কাছে তারা টিকতে পারল না। (পৃ.৬৩)।

১৯৪৬-এর ১৬-১৮ই আগস্টের বিবরণ এ গ্রন্থে আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে 'সত্য' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এ বিবরণ তা অনুমোদন করে না। অন্য বিবরণ বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর শুধু একটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। যেমন: 'মুসলমানরা মোটেই দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল না, একথা আমি বলতে পারি।' (পৃ. ৬৫)

১৯৪৭-পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রেও দেখা যায়

বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য থেকেই আমরা যথার্থ ধারণাটি লাভ করি। শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী কিংবা ভাসানী সকলের সম্পর্কেই ইতিবাচক-নেতিবাচক মিলে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন তিনি করেন। যেমন, ভাসানী সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন:

> এই দিন আমি বুঝতে পারলাম মওলানা ভাসানীর উদারতার অভাব, তবুও তাঁকে আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতাম। কারণ, তিনি জনগণের জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত। যে কোনো মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় তারা জীবনে কোন ভাল কাজ করতে পারে নাই– এ বিশ্বাস আমার ছিল। (পৃ. ১২৮)

নেতাদের যথার্থভাবে মূল্যায়নের মতো তিনি রাজনীতির বিষয়টিকেও যুক্তিসম্মতভাবে বিচার করতে সক্ষম ছিলেন। সেজন্য ১৯৪৭-এ প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা জিন্নাহ যখন ১৯৪৮-এর মার্চে ঢাকায় এলেন এবং উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলেন তখন তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলায় তাঁকে এক মুহূর্ত চিন্তা করতে হয়নি। পরবর্তী ঘটনাধারা থেকেই তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করলেন, শাসকশক্তি ও শাসকদল জনবিচ্ছিন্নতার পথেই এগোচ্ছে। সুতরাং তার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকা অসম্ভব। তাঁর দুটি অনুভবের কথা প্রণিধানযোগ্য:

১. **টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের পরবর্তী মূল্যায়ন:** ১৯৪৭ সালে যে মুসলিম লীগকে লোকে পাগলের মতো সমর্থন করছিল, সেই মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়বরণ করতে হলো কি জন্য? কোটারি, কুশাসন, জুলুম, অত্যাচার এবং অর্থনৈতিক কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ না করার ফলে। ইংরেজ আমলের সেই বাঁধাধরা নিয়মে দেশ শাসন চলল। স্বাধীন দেশ, জনগণ নতুন কিছু আশা করেছিল, ইংরেজ চলে গেলে তাদের অনেক উন্নতি হবে এবং শোষণ থাকবে না। আজ দেখছে তার উলটা। জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছিল। এদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই আমাদের শাসকগোষ্ঠীর। (পৃ. ১১৯)

২. **১৯৪৯-এ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনকালে কারাগারে অবস্থানকালের ভাবনা:** (ক) আমি খবর দিয়েছিলাম, আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। (পৃ. ১২০)। এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠল আওয়ামী মুসলিম লীগ, জেলে থেকেই তিনি এর জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন। তাঁর ভাবনা: (খ) আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু ম্যানিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম, সময় এখনো আসে নাই, তাই যারা বাইরে আছেন তারা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন। (পৃ.১২১)

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পরপর কারামুক্তি, গোপনে লাহোরে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে নতুন রাজনীতির বিষয়ে পরামর্শ করে আসা, বারবার কারাগারে যাওয়ার মধ্যেই বিরোধী রাজনীতিকে বেগবান করার সর্বাত্মক চেষ্টা, বাহান্নতে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করা, কারাগারে অনশন, চুয়ান্নতে যুক্তফ্রন্ট গঠন, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, মন্ত্রিত্ব লাভ ও হারানো প্রভৃতির মধ্যেই জনকল্যাণমূলক রাজনীতিকে অগ্রসর করে নেওয়ার এক বিরামহীন প্রচেষ্টায় রত থাকেন তিনি। ১৯৪৭-পরবর্তী ৮ বছরের এই নতুন অসাম্প্রদায়িক চেতনার গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রকৃত রূপের ইতিহাসটি বঙ্গবন্ধুর এ গ্রন্থেই উত্তমরূপে লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজমন্ত্রটিও যুক্তিসম্মতভাবে লুকিয়ে আছে ওই রাজনীতির মধ্যে। এসব কারণেই আমি বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-কে এ কালের তরুণদের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ বলে মনে করি।

ভারত ভাগের পর মাত্র আট মাসের মাথায় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি দিবসে' তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে প্রথম কারাবরণ করেন ও পরবর্তীতে ২৪ বছরের ঔপনিবেশিক আমলের অর্ধেক সময় কারাগারেই অন্তরীণ ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই গ্রেপ্তারের (১১ই মার্চ, ১৯৪৮) পটভূমি ও পরবর্তীতে আন্দোলনের মুখে জেল থেকে মুক্তির ঘটনা সবিস্তারে আছে গ্রন্থের ৯২-১০০ পৃষ্ঠায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরপ্রতিবাদী বঙ্গবন্ধুর ভাষায়–

> আমি বলেছিলাম, কোনো নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। যেমন হযরত ওমরকে (রা.) সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বড়ো জামা পরেছিলেন বলে। বাংলা ভাষা শতকরা ছাপান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।

ঢাকার তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে বঙ্গবন্ধু রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা লিখেন–

> যখন খাতাগুলোর পাতা উলটাচ্ছিলাম আর হাতের লেখাগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছিলাম আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আব্বা আমাকে যেন বলছেন, ভয় নেই মা, আমি আছি, তুই এগিয়ে যা, সাহস রাখ। আমার মনে হচ্ছিল, আল্লাহর তরফ থেকে ঐশ্বরিক অভয় বাণী এসে পৌঁছাল আমার কাছে। এত দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মাঝে যেন আলোর দিশা পেলাম।

বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থত্রয় *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়া চীন* এবং বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য ভাষণ, অভিভাষণ, বক্তৃতা, বিবৃতি, বাণী ও নির্দেশনা আমাদেরকে প্রতিনিয়তই আলোর পথে এগিয়ে নিচ্ছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণে নতুন প্রজন্মকে আলোতে অবগাহনের জন্য আমরা যখন 'আলো, আমার আলো, ওগো আলো ভুবন ভরা'– গেয়ে শুনাই তখন সত্যিই উপলব্ধি করি আমাদের বঙ্গবন্ধু ভুবন সতত থাকে ঊষার আলোয় দেদীপ্যমান। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও নিরন্তর ভালোবাসা।

লেখক: সাবেক উপাচার্য ও অধ্যাপক, সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে ‘আরেক বাংলাদেশে’র গল্পকথা

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

এ বছর মুজিববর্ষ, আর আগামী বছর বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী। এ সময় আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক, আমাদের জাতীয় উন্নয়নের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন আর স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরপূর্তি উপলক্ষে নানা উদ্‌যাপনে ব্যস্ত থাকার কথা পুরো জাতির। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি আমাদের সব আয়োজন স্থবির করে দিয়েছে। তবুও অনলাইনে কিছু আয়োজন করে সে অভাব পূরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সামনাসামনি মতবিনিময়ের সাধ এভাবে পূরণ করা যায় না। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মনে বঙ্গবন্ধুকে গেঁথে দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে সশরীরে যোগ দিতে না পারাটা ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে। এই সংকটপূর্ণ পরিবেশেই এবারে আমরা বিজয় দিবস পালন করতে যাচ্ছি।

মহামারির ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি আর অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা সামলেই আমাদের এগুতে হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণে এই সংকট আমরা বেশ ভালোভাবেই সামলাচ্ছি। নিরাপদ টিকা এসে গেলেই পুরো দেশ ফের পুরোনো অবয়বে আনন্দযজ্ঞে মাতবে বলে আমার বিশ্বাস। সারা বিশ্বই এই টিকার অপেক্ষায় আছে। যুক্তরাজ্য আর রাশিয়ার মতো কোনো কোনো দেশ ইতোমধ্যেই টিকা দেওয়া শুরু করেছে। এমন চ্যালেঞ্জিং সময়কে প্রতিরোধ করেই বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। মানুষের জীবন ও জীবিকা সচল রাখতে তিনি নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু যেমন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে সেই পথেই হাঁটছে আমাদের প্রিয় স্বদেশ। বিগত উনপঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ অসাধ্য সাধন করেছে। বিশেষ করে ২০০৯ সালের পর বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে সবার জন্য উন্নয়নের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, তা সত্যি অনন্য। অর্থনীতির প্রতিটি সূচকেই বাংলাদেশ নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেছে। বিরতিহীনভাবে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। কমেছে দারিদ্র্য।

বর্তমানে দারিদ্র্য নিরসন, প্রবৃদ্ধির অর্জন এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সামাজিক সূচকে অভাবনীয় অগ্রগতির কারণে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের সামনে উপস্থিত হয়েছে রোল মডেল হিসেবে। সুবর্ণ জয়ন্তীতে এ গল্পই বিশ্ববাসীকে আমাদের শোনানোর কথা ছিল। করোনার কারণে সেভাবে তা করা যাচ্ছে না। তবুও সামষ্টিক উন্নয়নে যে অগ্রগতি আমরা বিগত যুগ ধরে অর্জন করছি, তা কম নয়। মনে রাখতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী তার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাই কেবল বাঙালি নয়, পাশাপাশি বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ভরসার প্রতীকে পরিণত হতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। নির্যাতিত-লুণ্ঠিত বাংলাদেশের অবকাঠামো ও জীবনচলা পুনর্বাসন করার অভিজ্ঞতার আলোকেই তাই ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে উচ্চারণ করেছিলেন আশার বাণী। তিনি সেদিন বলেছিলেন–

> *অনাহার, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও বুভুক্ষার তাড়নায় জর্জরিত, পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার শঙ্কায় শিহরিত বিভীষিকাময় জগতের দিকে আমরা এগোবো না, আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম।*

জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার, ঢাকা

জনমানুষের প্রতিভা ও পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টিশীল অগ্রযাত্রার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু তাঁর উন্নয়ন কৌশল বিদেশ থেকে ধার করে আনেননি। তিনি তাই এমন এক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা চালু করার অঙ্গীকার করেছিলেন যেখানে ‘কৃষক, শ্রমিক ও জ্ঞানী মানুষের’ আধিপত্য থাকবে। এই বিচক্ষণতা ও প্রান্তিক মানুষের প্রতি দরদ থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর তৈরি সংবিধান ও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এমন সব কৌশলের কথা বলেছেন যেসব বাস্তবায়ন করে আজ বাংলাদেশ এই সংকটকালেও মানবিক উন্নয়নের এক মডেলে পরিণত হয়েছে। তাঁর কাঙ্ক্ষিত এই উন্নয়ন অভিযাত্রাকে যে মুন্সিয়ানার সাথে বঙ্গবন্ধুকন্যা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তা সত্যি দেখার মতো। সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে আমরা বঙ্গবন্ধুর চিন্তার আলোকে বঙ্গবন্ধুকন্যার হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের গর্বিত এক ভঙ্গি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার স্বপ্ন দেখছি। শুধু সরকার নয়, এদেশের প্রতিটি গর্বিত নাগরিকের উচিত হবে এগিয়ে যাওয়া, মাথা উঁচু করে এই বাংলাদেশের উপাখ্যান তুলে ধরা।

অন্য যে-কোনো দেশের চেয়ে আমাদের উন্নয়নের কৌশল একইসঙ্গে প্রবৃদ্ধি সহায়ক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বলেই আমরা বাকিদের জন্য রোল মডেল হতে পেরেছি। সমাজের পিরামিডের পাটাতনে থাকা মানুষগুলোও এই উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত হননি। অর্থনৈতিক বৈষম্য আরেকটু কমাতে পারলে নিশ্চয় আরো বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। তা সত্ত্বেও বলা যায়, অন্য অনেক দেশের চেয়ে আমাদের উন্নয়ন ছিল অনেকটাই অংশগ্রহণমূলক। বিশেষ করে সরকারের নীতিমালা যেমন অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল, আমাদের সরকারের বাইরের ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোক্তাদের অবদানও কম নয়। সবাই মিলেই আমরা এই সর্বজনের কল্যাণে নিবেদিত আর্থসামাজিক রূপান্তরের পাটাতনটি শক্তভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। এমডিজি ও এসডিজি বাস্তবায়নে ফলাফল নির্ভর যে

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা

কৌশল আমরা গ্রহণ করেছি তার সুফল পেয়েছি। এখনো পাচ্ছি নেতৃত্বের বিচক্ষণতায়। তবে এই মহামারি ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা আমাদের সামলাতে হচ্ছে। এক্ষেত্রেও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ। 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' জলবায়ু সহায়ক উন্নয়নের বিশ্ব প্রবক্তায় পরিণত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশ্ব ফোরামসমূহে তাঁর সবুজ আহ্বান বিশ্বজুড়েই গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হচ্ছে। আগামী বছর স্কটল্যান্ডে কপ-২৬ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আশা করা যায়, জলবায়ু বিষয়ক এই বিশ্ব সম্মেলনেও তিনি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের ন্যায্য দাবি বলিষ্ঠভাবেই তুলে ধরবেন। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের পরিবর্তন একটি শুভ পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে। যুক্তরাজ্যের সাথে একযোগে কাজ করে বাংলাদেশ সুবর্ণ জয়ন্তীর এই বছরে সবুজ বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকারকে সামনে আনতে পারবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন অভিযাত্রার সুফল আরো ভালোভাবে ধরা পড়বে কিছুদিন পর। তবে এর মধ্যেই আমাদের সাফল্যের সবুজ চারাগুলো দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। এই সাফল্যের সবচেয়ে বড়ো দৃশ্য ধরা পড়বে গ্রামবাংলার বিস্ময়কর রূপান্তরের দিকে তাকালে। আজকাল গ্রাম আর শহরের জীবনযাত্রা ও সুযোগ-সুবিধার তফাৎ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। বিশেষ করে আমাদের অর্থনীতির মূল রক্ষাকবচ কৃষির উন্নতি সত্যি অসাধারণ। হেক্টরে এক টন ফসল উৎপাদন করতে পারতাম স্বাধীনতার উষালগ্নে। এখন আমরা উৎপাদন করি চার টনেরও ওপরে। আর কৃষিতে যে বহুমুখীকরণের জোয়ার লেগেছে তা তো বলাই বাহুল্য। সবজি, মাছ, পোল্ট্রি ও লাইভস্টক উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। আর কৃষি ভালো করছে বলে ভোগ বাড়ছে। বাড়ছে মানুষের আয়-রোজগার। তাই চাহিদাও বাড়ছে। ফলে শিল্পেরও প্রসার ঘটেছে। গ্রামীণ অর্থনীতির এই চাঙ্গা ভাবের কারণে এই করোনাকালেও আমাদের প্রবৃদ্ধির হার পৃথিবীর ষষ্ঠতম সেরা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবৃদ্ধির দৌড়ে আমরাই প্রথম। আসলেই বাংলাদেশের উন্নয়নের এই জয়যাত্রার গল্প অভাবনীয়। এ গল্প এখনো বলা হয়ে ওঠেনি। সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে আমরা এই গল্পের রূপরেখা তুলে ধরতে চাই। পুরো গল্প আমরা আগামী বছরজুড়েই বলব।

মুক্তিযুদ্ধের পর পর ছাইভস্ম থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। শুরুতে অনেকে এদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র সাথে তুলনা করলেও ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতোই উঠে দাঁড়িয়েছি আমরা। এই অতুলনীয় অভিযাত্রার গল্প এখনো আমরা যুক্তিপূর্ণভাবে বলে উঠতে পারিনি। বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখা শুরু করেন সেই ছাত্রজীবন থেকেই। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের বুভুক্ষা ও দুর্দশা দেখে তিনি দারুণ বিপর্যস্ত ছিলেন। ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপে কী করে সমৃদ্ধ বাংলায় এমন একটি দুর্ভিক্ষ হতে পারল সেসব কথা তিনি তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে লিখেছেন। একইসঙ্গে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সমৃদ্ধ স্বদেশ গড়ার। এর প্রমাণ মেলে মাত্র ৩২ বছর বয়সে তাঁর চীন সফরের অভিজ্ঞতানির্ভর *আমার দেখা নয়া চীন* বইতে। তন্ন তন্ন করে তিনি চীনের সংস্কারের সন্ধান করেছেন সে সময়। কী করে চীনের সরকার ও মানুষ কৃষি, শিল্প ও শিক্ষায় সংস্কার এনে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন তার সূত্র খুঁজেছেন। মনে হয় তিনি তৈরি করছিলেন নিজেকে। দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলেই যে তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের খোলনলচে বদলে ফেলবেন তার যথেষ্ট ইঙ্গিত তাঁর বইতে রেখে গেছেন। তাই স্বাধীন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই তিনি কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে নেমে পড়েন। ভালোই চলছিল সেই উন্নয়ন অভিযাত্রা। মাত্র আট বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু।

১৯৭২-এ মাথাপিছু আয় ছিল ৯৩ ডলার। ১৯৭৪-এ তা ২৭৩ ডলারে উন্নীত করেছিলেন। পঁচাত্তরে শারীরিকভাবে তাঁকে স্বদেশবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে ফেলা হলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কোথায় গিয়ে পৌঁছুতে পারত তা শুধু আমরা অনুমানই করতে পারি। এরপর স্বদেশ চলল উলটো পথে। অন্ধকারের দিকে। পরবর্তীতে অনেক ত্যাগ ও রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে স্বদেশ ফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের পথে।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শনের আলোকে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই ২০০৯ সাল থেকেই প্রতিবছর কৃষিতে অন্তত ৯ হাজার কোটি টাকার ভরতুকি দেওয়ার পাশাপাশি কৃষিযন্ত্র ক্রয়, বীজ ক্রয়, প্রযুক্তিনির্ভর সহায়তা সম্প্রসারণ এবং কৃষি উন্নয়নে ব্যক্তি খাতকে যুক্ত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বলেই করোনা মহামারি ও বন্যার প্রকোপের পরও কৃষির রয়েছে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে রক্ষাকবচ হওয়ার সম্ভাবনা। এই দুর্দিনেও কৃষক খুশি। কেননা আমন ধানের ভালো ফলন পাচ্ছেন তারা। কৃষি শ্রমিকেরাও খুশি। কেননা তারাও ভালো হারে মজুরি পাচ্ছেন। গ্রামীণ মানুষের আয়-রোজগার ভালো। এর সাথে যোগ হচ্ছে বাড়তি প্রবাস আয়। সরকারের প্রণোদনা দেওয়ায় প্রবাসীরা বেশি করে ব্যাংকের হিসেবে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন এখন। গেল মাসেও দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি প্রবাস আয় এসেছে। ফলে গ্রামে ভোগ ও চাহিদা– দুইই বাড়ন্ত। তাই শিল্পপণ্যের চাহিদাও যথেষ্ট। বাংলাদেশ ব্যাংক এই ডলারের বড়ো অংশ ব্যাংক থেকে কিনে নেয় বলে অর্থ বাজারে তারল্য ভারসাম্য বজায় রয়েছে। সরকার বেশি করে ব্যাংক ঋণ নিতে পারছে। ব্যাংকগুলো কম সুদে ভালো উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে পারছে। বাজেট ঘাটতি নিয়ে এই সংকটকালে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। অর্থনীতি সচল রাখতে যা করা দরকার তাই করছে সরকার। আশার কথা যে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ মিলছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ মেগাপ্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে সরকার নজর রেখেছে। তাই আমাদের স্বপ্নের মিনার 'পদ্মা সেতু' এখন দৃশ্যমান। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট চালু রয়েছে। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। ডিজিটাল অবকাঠামো জোরদার হচ্ছে। সব মিলে আস্থার পরিবেশ বজায় রয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান বজায় থাকায় শহরের অনানুষ্ঠানিক বেকার কর্মীদেরও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তব সত্যি। তাঁর হাত ধরেই স্বদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। যাবে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাঁর পিতার মতোই মানুষের কল্যাণে অন্তপ্রাণ। আর তাই কল্যাণমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আজ সারা বিশ্বের সামনে এক রোল মডেল হিসেবে দাঁড় করাতে পেরেছেন। কেবল বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তা নয়, বরং সারা বিশ্বেরই তিনি অন্যতম শীর্ষ নেতা। তিনি অনেক দূরে দেখতে পান। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলা করতে নিজ দেশের জন্য তৈরি করেছেন বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০। তার আলোকে জাতিসংঘের ৭৫তম সাধারণ অধিবেশনে সুনির্দিষ্ট এবং যথার্থ দিক নির্দেশনামূলক পাঁচ দফা প্রস্তাবনা রেখেছেন। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, বৃহৎ দূষণকারী দেশগুলোর জাতীয় নির্ধারিত অবদান বৃদ্ধি, দুর্বল দেশগুলোকে প্রতিশ্রুত তহবিল সরবরাহ এবং জলবায়ু শরণার্থী পুনর্বাসনকে বৈশ্বিক দায় হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রতি যে আহ্বান তিনি জানিয়েছেন– তা বিশ্ব মানবতার কল্যাণ নিয়ে তাঁর সুদূরপ্রসারী ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। সম্প্রতি লন্ডনের *দি ফাইনান্সিয়াল টাইমস* পত্রিকায় তাঁর দূরদৃষ্টির প্রমাণ দিয়ে লিখেছে যে, আজকের কর্মসংস্থান নিশ্চয়ই জরুরি। তবে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানও সমান জরুরি। তাই আগামী কয়েক দশকের সবুজ ও পরিচ্ছন্ন পৃথিবী নির্মাণের পাটাতন গড়তে এখনই মনোযোগী হতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন মহামারিজনিত অর্থনৈতিক মন্দার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি সংকুচিত হবে ৫.২ শতাংশ। এখানেও বাংলাদেশ উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই দুর্যোগের বছরেও এডিবি বলছে ৬.৮ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হবে। এমনকি রক্ষণশীল আইএমএফ বলছে, দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ প্রায় চার শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বাংলাদেশ। আশা করা যাচ্ছে এ প্রবৃদ্ধি আরো বেশি হবে। গত এক দশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতি গ্রহণ ও সেগুলোর বাস্তবায়ন করা গেছে বলেই এমন অর্জন সম্ভব হয়েছে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ডিজিটাল আর্থিক সেবার কল্যাণে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াচ্ছে মহামারিতে স্থবির হয়ে পড়া অর্থনীতি। এই গতিময়তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রণোদনা কর্মসূচিগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। এখন দরকার তা ঠিকঠাক হচ্ছে কি-না তার মনিটরিং নিশ্চিত করা। বিশেষ করে কৃষক, ক্ষুদে ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণীত প্রণোদনা কর্মসূচিসমূহ যাতে ঠিকঠাক মতো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয় সেদিকে কড়া নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড চালু করে অচিরেই মনিটরিং-এর কাজে গতি আনবে বলে আশা করছি। ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম আরো দ্রুত বাস্তবায়ন করা গেলে এসএমই ঋণ দেওয়া নিয়ে ব্যাংকের ভয় কেটে যাবে। চলতি মূলধনের প্রণোদনা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরো দ্রুত বিতরণের সুযোগ রয়েছে। চলতি মূলধনের পাশাপাশি এই কর্মসূচির একাংশ মধ্য-মেয়াদি ঋণ হিসেবেও দেওয়া যেতে পারে। ই-কমার্স ও এফ-কমার্স করছেন যেসব নতুন উদ্যোক্তা তাদের ব্যাংক হিসেবটিকেই ট্রেড লাইসেন্স হিসেবে গণ্য করে ছোটো আকারের চলতি মূলধন ডিজিটাল তথ্য ব্যবহার করে কয়েক মিনিটেই দেওয়া সম্ভব। বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। কাজটি দ্রুত প্রসার করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এসব করা গেলে নিশ্চয় ব্যাবসাবাণিজ্যে ভরসার পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে। টাকার চেয়ে ভরসাই এই দুঃসময়ে বেশি জরুরি। আর জরুরি নিয়মনীতি সহজ করে ফেলা। উদ্যমী মানুষ বাকিটা নিজেরাই করে নিবেন।

'সোনার বাংলা'র হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণকে সাথে নিয়ে নিরন্তর সংগ্রাম করে দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সদ্য স্বাধীন দেশে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়াতেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর উন্নয়ন দর্শনের আলোকেই দেশকে সেই একই স্বর্ণপথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ ও সেগুলোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি এ দেশের মানুষের মধ্যে গড়ে তুলেছেন শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে সফল হওয়ার আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই আমরা আগামীর পথে চলেছি। জয় আমাদের হবেই। ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও জাতির কল্যাণের শপথ নিয়েই উদ্‌যাপন করতে চাই মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

প্রফেসর ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টি এবং নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল অপরিসীম। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই মুসলিম লীগের পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের বদলে বাঙালিরা ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়। আর এর পেছনে মূল প্রেরণা জোগান ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। তাঁরা বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে ষাটের দশকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড়ো ভূমিকা ছিল। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মূল লক্ষ্যবস্তু। যদিও নয় মাস শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নয়, সমগ্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের আক্রোশ ছিল এবং এ কারণে পরিকল্পিতভাবে এ সম্প্রদায়কে নিধনের সিদ্ধান্ত নেয়। অনেকাংশে তারা সফলও হয়। যদিও ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় তাদের পরিকল্পনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি।

যে-কোনো দেশে চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে অগ্রসর শ্রেণি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। সাধারণ অর্থে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আমলা, কূটনীতিবিদ, বিজ্ঞানী– যাঁরা বিভিন্ন বুদ্ধিভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত তাঁদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়। কোনো কোনো মনীষী মনে করেন একটি মানুষের দেহের জন্য মস্তিষ্কের যেমন গুরুত্ব, সমাজের জন্য বুদ্ধিজীবীগণ তেমনি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। তাঁরাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁদের লেখালেখি, বক্তব্য হয়ে ওঠে প্রতিবাদের দাবানল। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আপামর জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে, মুক্তির লক্ষ্যে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধে যথার্থ ভূমিকাই রেখেছিলেন।

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, দীর্ঘকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যেসব বুদ্ধিজীবী জড়িত ছিলেন তাঁরাও যেমন মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ে জড়িত ছিলেন না তাঁরাও এক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। অবশ্য বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা শুধু যুদ্ধের নয় মাসেই সীমিত ছিল না। ব্রিটিশ আমলে পরাধীনতার বিরুদ্ধে, পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের প্রতিটি সংগ্রামে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে এঁরা ছিলেন অনুপ্রেরণাদানকারী, কেউ কেউ সামনের কাতারে। বাঙালি জাতির ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, অত্যাচারের বিষয় সাধারণ মানুষকে অবগত করেছিলেন তাঁরা। বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ যে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে এটা সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা সেই সত্যটা আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তাঁরাই প্রথম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি স্বতন্ত্র অর্থনীতি চালুর কথা বলেছেন। বাঙালি সাংবাদিকরা তুলে ধরেছেন আন্দোলনের প্রতিটি খবর, শিল্পী-সাহিত্যিকরা গল্প, উপন্যাস, নাটক, গানসহ লেখনীর মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক, মৌলিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের প্রতি সচেতন করে তুলেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কখনো স্বতন্ত্র, কখনো একসঙ্গে করেছেন আন্দোলন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন বুদ্ধিজীবীরা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় বাঙালি আইনজীবীরা কৌশলে সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে আসামিদের জবানিতে বের করে এনেছেন পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈষম্য ও শোষণের চিত্র। পত্রিকাগুলো সেগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করেছে। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্রদের বাঁচাতে গিয়ে নিজেই পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা। তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কারফিউ ভঙ্গ করে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। কেউ তাদের বলেনি বের হয়ে আসতে, ড. জোহাকে তারা জানে না, বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাকুক, কোনো বিদ্যালয়েই যায়নি তাদের অধিকাংশ মানুষ। কিন্তু ড. জোহার আত্মত্যাগে প্রেরণা লাভকারী মানুষের স্রোতে সেদিন আইয়ুব-মোনায়েমের পতন ঘটেছিল।

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে একইভাবে স্বৈরশাসন কায়েম করলে একইভাবে বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ জানান। একাত্তরের অসহযোগ

আন্দোলনকালীন তাঁরা রাজনীতিবিদ ও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে থেকে কাজ করেন। ১৯৭১ সালে যখন গণহত্যা শুরু হয় তখন বাংলাদেশের মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি মর্মান্তিকভাবে বেজেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে ছিল এ ঘটনার পর নিশ্চিত জেনেছে যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোনো বাঙালির বাঁচার উপায় নেই। বুদ্ধিজীবীদের বড়ো অংশ তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ভারতে আশ্রয় নেওয়া বুদ্ধিজীবীরা গড়ে তুলেন 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি', যার সভাপতি ছিলেন ড. আজিজুর রহমান মল্লিক (ভি. সি. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)। এছাড়া তাঁকে সভাপতি এবং জহির রায়হানকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় 'বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম পরিষদ'।

বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেল গঠন করে। বিশ্বে বুদ্ধিজীবীদের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সরবরাহ ও বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, সংসদীয় পার্টির সঙ্গে সাক্ষাৎ, সাহায্যের আবেদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য প্রদান, শরণার্থীদের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁরা ভূমিকা রাখেন। শরণার্থী শিবির শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে ৫৬টি স্কুল খুলে শরণার্থীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র', যা বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামীদের প্রেরণার উৎস ছিল। এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন।

মনীষী গোর্কি বলেছেন, মাছের যেমন পচন শুরু হয় মাথা থেকে, তেমনি কোনো জাতিরও অধঃপতনের সূত্রপাত হয় মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধিজীবী শ্রেণি থেকে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি একটি জাতির সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তাকে উৎখাত করে নিজেদের শোষণ ও শাসন চিরস্থায়ী করার জন্য এই মনীষীর বাক্যকেই ঘৃণ্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তারা একদিকে বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য এবং অন্যদিকে এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, আইনজীবী, রাজনৈতিক প্রভৃতি শ্রেণিকে পঙ্গু ও নির্জীব করার জন্য জেল-জুলুম ও হয়রানি চালায়। লোভ-লালসাও দেখানো হয়। এই জালে বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ ধরা দিলেও বুদ্ধিজীবীদের বড়ো অংশই ছিলেন জনগণের পাশে। কখনো পেছন থেকে কখনোবা প্রকাশ্যে তাঁরা স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়েছেন। বুদ্ধিজীবীদের এই ভূমিকার কারণে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতার ফলে পাকিস্তান সরকারের ধারণা হয় যে, মূলত বুদ্ধিজীবীদের উসকানিতেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা চেয়েছে। তাই ২৫শে মার্চ গণহত্যার সূচনা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রছাত্রীরা এই প্রথম আক্রমণের শিকার হন। ঢাকার জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হলে প্রায় ৫০০ জন ছাত্র হত্যা করে এবং গণহত্যার শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক নিহত হন। এই হত্যাযজ্ঞ এরপর বাংলাদেশের সর্বত্রই চালানো হয়। প্রধান প্রধান শহরগুলোতে, বিশেষত যেসব জায়গায় পাকিস্তানি সেনানিবাস ও সৈন্য ঘাঁটি ছিল সেখানে বিভিন্ন শ্রেণির বুদ্ধিজীবী নির্মূল অভিযান চালায়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায় অর্থাৎ ডিসেম্বরে বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাঙালি জাতিকে স্থায়ীভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পঙ্গু করতে বেছে বেছে বুদ্ধিজীবী হত্যা করে। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিকে স্থায়ীভাবে পরাধীন রেখে শোষণ অব্যাহত রাখা।

সারা দেশে বুদ্ধিজীবী নির্মূল অভিযানের নীলনকশা 'অপারেশন

সার্চলাইট' অনুযায়ী একযোগে গণহত্যা পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বুদ্ধিজীবী নির্মূল অভিযানকে ৩ পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলে। প্রথম পর্বে হত্যার শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও দেশের কয়েকজন খ্যাতিমান আইনজীবী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী ও রাজনীতিবিদ। তাঁরা শহিদ হন প্রধানত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার অংশ হিসেবে। দ্বিতীয় পর্ব চলে মে-নভেম্বর মাস পর্যন্ত। এ পর্বে প্রকাশ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড কম হলেও গোপনে পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের সহযোগিতায় বুদ্ধিজীবী নিধন চলে। বুদ্ধিজীবীদের তালিকা গণ-আন্দোলনের সময়ই প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ পর্বে তাঁদের হত্যার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজাকারদের উদ্ধারকৃত ডায়েরি থেকে বুদ্ধিজীবীদের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট হয় বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বাঙালিকে পঙ্গু করাই ছিল হত্যার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত পর্ব ছিল ১০ই ডিসেম্বর থেকে চূড়ান্ত বিজয়ের আগ পর্যন্ত। হানাদাররা পরাভূত হবে কিংবা মাত্র ৯ মাসের মধ্যে তাদের ভরাডুবি হবে একথা কল্পনাও করেনি। সেজন্য পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হলেও বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। ৩রা ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথ আক্রমণের মুখেও তাদের টনক নড়েনি। কারণ তখনো মার্কিন সপ্তম নৌবহরের আগমন তাদের শেষ ভরসা ছিল। কিন্তু জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে যুদ্ধবিরতির পক্ষে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেলে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরাজয় নিশ্চিত জেনে আলবদর ও রাজাকার বাহিনীর সহযোগিতায় ১০ই ডিসেম্বর থেকে বুদ্ধিজীবী অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড দ্রুত ঘটানো হয়। ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার গভর্নর হাউসে বোমাবর্ষণের পর ডা. মল্লিক মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর পাকবাহিনীর সকল আশা ধূলিসাৎ হলে ইতোমধ্যে আটককৃত কিংবা নতুন আটককৃত বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি হত্যা করা হয়। ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের মিরপুর শিয়ালবাড়ি ও মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে আরো অনেক বধ্যভূমিতে তাঁদের লাশ পাওয়া যায়। আবার কারো কারো লাশও পাওয়া যায়নি। স্বাধীনতার পর লাশের স্তূপে যাঁদের পাওয়া গিয়েছে তাঁদের সকলের হাত-পা-চোখ বাঁধা ছিল। কারো হাত নেই, কারো চোখ বা হৃৎপিণ্ড নেই। এগুলো নরপিশাচদের নির্যাতনের স্বাক্ষর বহন করে।

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ বাংলাদেশের সর্বত্র সংঘটিত হয়। এ যজ্ঞে শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, শিল্পী, আইনজীবী, রাজনৈতিক, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কেউ বাদ পড়েনি। যদিও স্বাধীনতার পর শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে করা হয়নি। তাই তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া যায় না। তবে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করে। এতে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে। এতে মোট ৯৮৯ জন শিক্ষাবিদসহ মোট ১,১০৯ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী মোট ৬৩৯ জন প্রাথমিক, ২৭০ জন মাধ্যমিক, ৫৯ জন কলেজ, ২১ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ ৯৮৯ জন শিক্ষাবিদ শহিদ হন। এছাড়া ৪১ জন আইনজীবী, ৫০ জন চিকিৎসক, ১৩ জন সাংবাদিক, ১৬ জন কবি-সাহিত্যিক, প্রকৌশলী, সরকারি কর্মকর্তা শহিদ হন। তদুপরি এ তালিকায় রয়েছে ৮জন শহিদ গণপরিষদ সদস্যের নাম। পরবর্তীকালে মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানের ফলে আরো অনেক শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নাম পাওয়া গিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ আইনজীবী গ্রন্থে ৬৪ জন শহিদ আইনজীবীর তালিকা রয়েছে। সরকার প্রাথমিকভাবে এক হাজার ২২২ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা অনুমোদন করেছে। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়নে গঠিত কমিটির প্রথম সভায় এ তালিকা অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৩ই ডিসেম্বর ২০২০ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সভা শেষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ শিক্ষকদের ২১ জনের মধ্যে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন শহিদ হন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, গোবিন্দ চন্দ্র দেব, সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ফজলুর রহমান খান, শরাফত আলী অন্যতম শহিদ বুদ্ধিজীবী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাইয়ুম, হাবীবুর রহমান, সুখরঞ্জন সমাদ্দার– এই তিনজন শহিদ হন। মানবদরদি চিকিৎসক ফজলে রাব্বী, আলিম চৌধুরী, শামসুদ্দীন, গোলাম মোর্তজা, জিয়াউর রহমানকেও ঘাতকরা রেহাই দেয়নি। জনগণের পক্ষে লেখার কারণে হত্যা করে সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, নিজামুদ্দিন আহমদ, গোলাম মোস্তফা, নাজমুল হক, শহিদ সাবেরকে। হত্যা করে আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নাজমুল হক সরকার, আবদুল জব্বার, আমিন উদ্দিনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার অপরাধে প্রাণ দেন প্রকৌশলী সামসুদ্দিন, নজরুল ইসলাম, সেকান্দার হায়াত চৌধুরী, চলচ্চিত্র ও গানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালনকারী জহির রায়হান, আলতাফ মাহমুদ, কিংবা সাহিত্যিক ইন্দু সাহা, সেলিনা পারভীন, মেহেরুন্নেসা বাদ পড়েনি হায়েনাদের বুলেট থেকে।

সকল দিক থেকে বাংলাদেশের মস্তিষ্ক ধ্বংস করাই ছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর উদ্দেশ্য। স্বাধীন বাংলাদেশ যাতে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বুদ্ধিজীবী নিধন করা হয়। পাকিস্তানিদের এ উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সফল হয়। বিভিন্ন পেশার লোকদের বেছে বেছে মেরে ফেলায় বাঙালি জাতি সাময়িকভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংকটের সম্মুখীন হয়। জহির রায়হানের মতো কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার, মুনীর চৌধুরী ও আনোয়ার পাশার মতো সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো প্রাজ্ঞ আইনজীবী অথবা আলিম চৌধুরী ও ফজলে রাব্বীর মতো চিকিৎসক থাকলে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর আরো উপকৃত হতো। গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মতো মানবতাবাদী দার্শনিক, আলতাফ মাহমুদের মতো সুরকার ও শিল্পী, নিজামুদ্দিন, শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো সাংবাদিক একদিনে গড়ে ওঠেন না। এঁদের মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি বাঙালি জাতিকে বহন করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানি হানাদারদের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সফল হয়নি। অমর শহিদ বুদ্ধিজীবীদের উপদেশ ও সহযোগিতায় দেশ এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

লেখক: অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ ও ডিন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

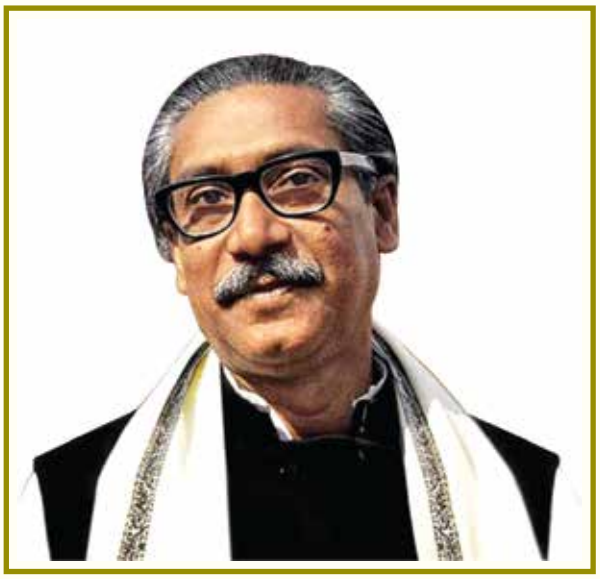

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধঃ আমাদের মিত্ররা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

দুই হাজার বিশ সালের ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশতম বিজয় দিবস। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে অর্ধশত বছরের মহান বিজয় দিবস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার ছাব্বিশে মার্চ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করব– তাও আমাদের গৌরবের বার্তা বহন করে আনবে।

বাঙালি এবং বাংলাদেশের দিনপঞ্জির ইতিহাসে একাত্তর স্বর্ণোজ্জ্বল বছর। এ বছরেই আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। যুদ্ধ করেছিলাম দখলদার পাকিস্তানি সৈন্য এবং এদেশীয় দালাল আলবদর, আলশামস ও রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে। নয় মাসের সেই যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছিলাম। পরাজিত করেছিলাম নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীদের। আর সেই পরাজয় ছিল পাকিস্তানিদের লজ্জার ও মাথা হেট করার। তারা দিনের বেলায় প্রকাশ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পণ করেছিল আমাদের মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে।

একাত্তরের সেই যুদ্ধটা কিন্তু এক বছরে সংগঠিত হয়নি। তবে যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রাপ্তিটা ঘটে এই একাত্তরে। শত্রুকে পরাজিত করে আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করি। অবশ্য এজন্য সংগ্রাম ও আন্দোলন করতে হয়েছে কয়েক বছর ধরে। বাঙালি কওমের সেই ইতিহাস জাতি ও দেশ প্রতিষ্ঠার লড়াই। এ জনপদে বাঙালি কখনো স্বাধীন ছিল না। মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতান, পাঠান, মোগল, নবাব, কোম্পানি ও রানিরা ছিলেন নন-বাঙালি। তবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জনপদটা ছিল। তারা স্বাজাত্য বজায় রেখেই লড়াই করেছে। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু নিজেদের আবাসভূমি কখনো শত্রুমুক্ত হয়নি। ব্রিটিশ আমলে চতুর ইংরেজরা উপমহাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। আমরা তখন স্বাধীনতার নামে দুই জাতি আলাদা দেশের বাসিন্দা হই। তারা অবশ্য কূটকৌশলে সেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের নামে বাঙালির জন্মভূমিকে বিভক্ত করে। তারই রেশ ধরে সাতচল্লিশের স্বাধীনতা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যায় ভারতে, আমাদের মাতৃভূমি পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভুক্তিতে পরিচিত হয়। মূলত তখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানিদের উপনিবেশ। স্বাধীনতার নামে বাঙালিদের ধোঁকা দেওয়া হয়। শোষণ শুরু হয় সর্বক্ষেত্রে। শাসন ক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। তারা প্রথমেই আক্রমণ করে আমাদের মাতৃভাষার ওপর। বাঙালি সেই প্রথম জেগে উঠল মায়ের ভাষাকে, মায়ের কণ্ঠকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য।

তখন শেখ মুজিবুর রহমান নামের এক যুবক কলকাতায় স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করে ঢাকায় এলেন। বাড়ি তাঁর গোপালগঞ্জের অজপাড়াগাঁ টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি কৈশোর থেকেই ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। মানুষের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন দেখলেই রুখে দাঁড়াতেন। কলকাতায় থাকতেই রাজনীতির পাঠ নিয়েছিলেন। সাতচল্লিশের স্বাধীনতায় আগ্রহী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই স্বাধীনতার স্বাদ অচিরেই বিস্বাদে পরিণত হলো। পাকিস্তানিদের বাঙালিদের মাতৃভাষার ওপর আক্রমণ দেখে তিনি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন তমদ্দুন মজলিশ, ছাত্রলীগ এবং বন্ধুদের নিয়ে সেই ভাষা আন্দোলনের উন্মেষপর্বে। আন্দোলনে সক্রিয় হলেন ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। পরিণতিতে গ্রেপ্তার হলেন। আন্দোলন তীব্রতর হলো বাহান্নতে। প্রাণ দিয়ে বাঙালির মাতৃজবানের সত্তাকে রক্ষা করতে হলো। এরপরে চুয়ান্নর নির্বাচন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ইস্টবেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার একচ্ছত্র নেতা ছিলেন গোপালগঞ্জের সেই যুবকটি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেরও ছিলেন মহানায়ক। সংগ্রাম, আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ মানে শেখ মুজিব। শেখ মুজিব বাংলাদেশের অপর নাম। তিনি বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি বাঙালির বন্ধু ও বাঙালির আলাদা কওম ও সত্তা প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম ও আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি যুদ্ধের জন্য সমগ্র বাঙালিকে প্রস্তুত করে দেওয়া। পৃথিবীর সকল বিপ্লবই সফল হয়েছে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের অন্তরীণে থেকেও সফল হয়েছেন অনুগামীদের প্রদত্ত নির্দেশনামা ও পরামর্শ দিয়ে। যুদ্ধেই আমরা অর্জন করেছি স্বদেশের স্বাধীনতা এবং তাঁকেও ফিরিয়ে আনতে পেরেছি পাকিস্তানিদের ফাঁসির রজ্জু থেকে। একাত্তরে আমরা যুদ্ধে জয়ী না হলে তাঁকে আমরা হারাতাম। আমাদের অস্তিত্বও ভিয়েতনামের মতো হতো। হয়ত কয়েক বছর যুদ্ধ করতে হতো। তবে আমাদের রক্ত বৃথা যেত না।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বলছি– একাত্তরের যুদ্ধটা এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়। পাকিস্তানিরা আমাদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে পঁচিশে মার্চের রাতে এ বাংলায় শুরু করল গণহত্যা। আমরা রোখার চেষ্টা করলাম। তখন আমরা ছিলাম অস্ত্রহীন। সমগ্র বাংলাদেশ তারা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এবং মানুষদের ঘরছাড়া করে দখল নিল। একাত্তরের সত্তরে বিজিত আওয়ামী লীগের দুই কক্ষের সদস্যরা আগরতলায় মিলিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার আলোকে সরকার গঠন করলেন। শপথ নিলেন ১৭ই এপ্রিল

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে। বিশ্ব জেনে গেল বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের কথা। একাত্তরের সেই সরকারই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। এ যুদ্ধে আমরা স্বাধীনতাকামী সকল স্তরের লোক– জোয়ান, বুড়ো, নারীসমাজ অংশ নেই। অংশ নেন আনসার, ইপিআর, ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকেরা। অংশ নেয় না জামাত, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম নামধারী লোকেরা এবং বঙ্গভঙ্গকারীদের উত্তরসূরিরা। এরা একাত্তর, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বাস করে না।

একাত্তরের যুদ্ধে আমরা ত্রিশ লক্ষ প্রাণ হারিয়েছি। দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে। আর পুরো দেশটাকে বিরান ভূমিতে পরিণত করেছিল নরঘাতক পাকিস্তানিরা। আমাদের সেই যুদ্ধে বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষ ও রাষ্ট্র সরাসরি সমর্থন জানিয়েছিল। আমাদের মূল শত্রু পাকিস্তান, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই সমর্থন করেছিল। আবার কিছু রাষ্ট্র আমাদের সমর্থন না করলেও পাকিস্তানিদের পক্ষেও সমর্থন জানায়নি। আমাদের পক্ষে সরাসরি ভারত, ভুটান, নেপাল, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ ইউরোপের অধিকাংশ দেশ সমর্থন জানিয়েছিল। মূলত একাত্তরের যুদ্ধে দুই পরাশক্তি চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানদের অস্ত্র ও সমর্থন দিয়ে ভারত-রাশিয়াকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করায়। তা না হলে বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহর আসবে কেন? আমাদের ভাগ্য ভালো মহাযুদ্ধটা হয়নি। এর দশ-বারো দিনের যুদ্ধেই পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে।

একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মিত্রশক্তি ছিল ভারত-রাশিয়া। ভারত আমাদের সরাসরি সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে। ভারতকে ঘিরেই আমাদের যুদ্ধটা পরিচালিত হয়। তাদের মাটিতেই ছিল আমাদের সকল আস্তানা। শরণার্থীদের আশ্রয়, বেতারকেন্দ্র, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র প্রদান এবং যুদ্ধকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে যৌথ কমান্ড গঠন ও সর্বশেষ বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির রজ্জু থেকে বাঁচিয়ে স্বদেশে আনা কেবল ভারত এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধীরই অবদান। যুদ্ধ থামানোর জন্য পাকিস্তানিদের জাতিসংঘের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুই দুইবার ভারতের অনুরোধেই রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করে।

আর ভারতের জনগণের সমর্থন নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর জন্য গোটা বিশ্ব বেড়ান সেই আমাদের যুদ্ধের বছরে। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতের প্রায় ১৫ হাজার সৈন্য প্রাণ হারায়। আর একাত্তরের শুরু থেকেই পশ্চিম বাংলার মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়ায় সব কিছু নিয়ে। ইন্দিরা গান্ধী দিল্লি থেকে ছুটে আসেন শরণার্থী শিবিরে। সেসব দিনের স্মৃতি আজো আমরা মনে রেখেছি। মনে রেখেছি ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যা শুরু হলে ইন্দিরা গান্ধী:

- ২৭শে মার্চ লোকসভায় আমাদের সমর্থনে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।
- ৩১শে মার্চ সহানুভূতি জানিয়ে সংসদে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।
- ৯ই আগস্ট রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করেন।
- ১৫ই আগস্ট মুজিবের গোপন বিচার সম্পর্কে রাষ্ট্রপ্রধানদের

কাছে তারবার্তা পাঠান।

- ৩০শে সেপ্টেম্বর ব্রেজনেভ, পদগর্নি ও কোমিগিনের সঙ্গে আলোচনা করেন।
- ৩১শে অক্টোবর লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
- ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতির জন্য নিক্সন প্রদত্ত সভায় ভাষণ দেন।
- ১০ই নভেম্বর জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধান উইলির সঙ্গে আলোচনা করেন।
- ২৭শে নভেম্বর মুজিবের মুক্তির জন্য ইয়াহিয়াকে আহ্বান জানান।
- ৩রা ডিসেম্বর কলকাতার বিশাল জনসভায় বাংলাদেশকে পুনরায় সমর্থন জানান।
- ৪ঠা ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আক্রমণ চালায়।
- ৬ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতির ঘোষণা দেন।
- ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় নিয়াজি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে।
- ৭ই জানুয়ারি ১৯৭২ শরণার্থী ফেরত পাঠানো শুরু হয়।
- ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তান কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ।
- ১০ই জানুয়ারি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎ।
- ৭ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাদর অভ্যর্থনা।
- ১৭ই মার্চ ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশের তিন দিনের সফর এবং পঁচিশ বছরের মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন।

পরবর্তীকালে দিল্লিতে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনাকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করেন।

ইন্দিরা গান্ধীর পাশাপাশি ভারতের জনগণ বিশেষ করে শিল্পীসমাজ আমাদের পাশে দাঁড়ান। বিশ্বখ্যাত ছবি আঁকিয়ে মুকবুল ফিদা হুসেন ছবি এঁকে বোম্বের বাসায় বিক্রি করে অর্থ বাংলাদেশে তহবিলে জমা দেন। কলকাতার কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা নিয়মিত বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা চালায়। আর মার্কিন সিনেটর কেনেডি, ফ্রেড হ্যারিস ও ম্যাসাচু বাংলাদেশের পক্ষে সে দেশে জনমত সৃষ্টি করেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, যুক্তরাজ্যের স্টোন হাউস, পাকিস্তানের ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, পিটার শোর, ফ্রাঙ্ক চার্চ, রিচার্ড টেইলর, জনকেলি প্রমুখ এবং জাপান, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার এমপিরাও বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেন। ছুটে আসেন শরণার্থী শিবিরে অনেকেই।

যুদ্ধের খবরাখবর প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আকাশ বাণী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বিবিসি ও ভোয়া। সংবাদপত্রের মধ্যে *আনন্দবাজার*, *যুগান্তর*, *সাপ্তাহিক দেশ* এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে *দি ডেইলি টেলিগ্রাফ*, *তানযুগ*, *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস*, *টাইমস* নিয়মিত সংবাদ-নিবন্ধ ছেপে মুক্তিযুদ্ধকে তরান্বিত করে। নিউইয়র্ক-এর মেডিসেন স্কোয়ারের রবীশঙ্করের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কনসার্ট ফর বাংলাদেশের কথা আমরা সবাই জানি। সেই কনসার্টে জর্জ হ্যারিসন, এরিক ও বব ডিলান (পরে নোবেল বিজয়ী) বাদ্যি-বাদন পরিবেশন করে সংগৃহীত অর্থ শরণার্থীদের জন্য প্রেরণ করেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মিত্রদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার ইতিহাস লিখে শেষ করা যাবে না। তাঁরা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে যে মানবিক অবদান রেখেছেন, তা অবিস্মরণীয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়– পঁচাত্তরের পর সেই অমলিন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালানো হয়। লেখা হয় মুক্তিযুদ্ধের বিভ্রান্ত কাহিনি। একুশটি বছর আমাদের উত্তর প্রজন্ম সেই মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনি পড়ে বড়ো হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। ইতিহাস তার আপন গতিতে লেখা হয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মিত্রমাতা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ২০১১ সালের ২৫শে জুলাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্মাননা প্রদান করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সম্মাননা গ্রহণ করেন তাঁর পুত্রবধূ সোনিয়া গান্ধী আর মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ওডারল্যান্ডকে বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয় ১৯৭৩-এ।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের চিহ্নিত করে রাখা দরকার। ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় এই ঐতিহাসিক কাজটি শুরু করেছে। পাশাপাশি একাত্তরের মিত্রদের সম্পর্কে জানা দরকার। পাঠ্যপুস্তকে সংক্ষেপে হলেও তাঁদের বিবরণ থাকা আবশ্যক। কারণ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেই আমরা স্বকীয়সত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমাদের মহানায়ক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একাত্তরে মহান বিজয় দিবসে দেশি-বিদেশি সকল বীর সৈনিকদের শ্রদ্ধা জানাই, স্মরণ করি প্রাণভরে। জয় বাংলা।

লেখক: সাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়োল্লাস

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব সুগভীর, যা বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সূচনা কাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এ নতুন চলচ্চিত্র ধারার জন্ম হলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেতনায় প্রভাবিত হয়েছে এ চলচ্চিত্র ধারায়। এই ধারাকে তাই মুক্তিসংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী — এই তিনটি কালপর্বে চিহ্নিত করা যায়।

মুক্তির সংগ্রাম পর্বে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে নির্মিত বেশ কিছু চলচ্চিত্রকে এ ধারার ভিত্তিভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রবীণরা অবগত আছেন, ঢাকায় ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠাকালে উর্দু চলচ্চিত্রের সাথে বাংলা চলচ্চিত্রের সম্পর্ক ছিল বিদ্বেষপূর্ণ ও দ্বান্দ্বিক। সে প্রেক্ষাপটেই প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার খান নির্মাণ করেন ঢাকার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬)। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংস্কৃতির যাত্রা শুরুর সময়ে এ এক বৈপ্লবিক ঘটনা। পাকিস্তানি উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চ্যালেঞ্জ করে এ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন তিনি।

এর আগেই ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পেয়ে গেছে সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ, সামনে চলে এসেছে মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবি। চলচ্চিত্রকাররা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে উর্দু চলচ্চিত্রের আগ্রাসন, চলচ্চিত্র নির্মাণে দেশীয় পুঁজির সংকট, প্রশাসনিক বৈরিতা, অপপ্রচার ও সার্বিক প্রতিকূলতার বিপরীতে একে একে নির্মাণ করেন *সুতরাং* (১৯৬৪), *রূপবান* (১৯৬৫), *বেহুলা* (১৯৬৬), *নবাব সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৭), *সাতভাই চম্পা* (১৯৬৮), *শহীদ তিতুমীর* (১৯৬৮) প্রভৃতি ছবি।[১] তবে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে বাঙালির স্বাধীনতার অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত করে তুলেছিল যে ছবি, তার নাম *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০)। এসব ছবির মাধ্যমে নির্মাতারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মানুষের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। জহির রায়হানকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের প্রথম নির্মাতা বলে গণ্য করা যেতে পারে। *জীবন থেকে নেয়া* নির্মাণের আগে ১৯৭০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক *চিত্রাকাশ* পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জহির রায়হান বলেছিলেন, 'আমি নতুন যে ছবি করতে যাচ্ছি তাতে দেশের এই আন্দোলনের পটভূমিকাতেই দেখাতে চেষ্টা করব একটি সংসার। আর সে সংসারই হবে সমগ্র দেশের প্রতীক। ছবিতে মোট ১১টি চরিত্র থাকবে। একেকটি চরিত্র হবে একেকটি দফার প্রতীক। এ ছবি করার জন্যই আমি লাহোর থেকে ঢাকায় ছুটে এসেছি। আটই ফেব্রুয়ারি থেকে শুটিং শুরু করব এবং আশা করি এক মাসের মধ্যেই ছবির সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

এ ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা', কাজী নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট', ইকবালের 'দুনিয়ার যত গরিবকে আজ জাগিয়ে দাও', আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। মুক্তিযুদ্ধের জন্য জাতিকে তৈরি করার জন্যই যেন জহির রায়হান এ ছবি বানিয়েছিলেন।[২] চলচ্চিত্র নির্মাণের এই ধারাকেই আমি বলি চলচ্চিত্র নির্মাণের মুক্তিসংগ্রামের ধারা।

আমরা সবাই জানি, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীনই নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য চলচ্চিত্রসমূহ। এমনকি এ কালপর্বে বিশ্বের অন্যান্য দেশের নির্মাতারাও সামিল হয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায়।

জহির রায়হান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নির্মাণ করেন বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *স্টপ জেনোসাইড*। পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস গণহত্যা ও শরণার্থীদের মৃত্যুর প্রতিরোধ স্পৃহার ওপর ভিত্তি করে তিনি এ ছবিটি নির্মাণ করেন, যা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে তাঁরই সরাসরি তত্ত্বাবধানে এ সময় নির্মিত হয় আরো ৩টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: *এ স্টেট ইজ বর্ন*, *লিবারেশন ফাইটার্স* এবং *ইননোসেন্ট মিলিয়নস*। এসব ছবিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, সাহসিকতাপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ, বিপ্লবী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের তৎপরতা এবং শরণার্থী নারী ও শিশুদের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরা হয়। এসব চলচ্চিত্রের অগ্নিমন্ত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে গড়ে ওঠে বিশ্বজনমত। বাংলাদেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান ও আলমগীর কবিরের নেতৃত্বে প্রবাসেই গড়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইউনিট। তাঁরা সেদিন জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ, বাঙালির অদম্য সাহস, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার চিত্রগ্রহণ করেছিলেন।

এসব চিত্রের বিষয় ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, শরণার্থীদের দেশত্যাগ, আশ্রয় শিবিরের দুঃখ-কষ্ট-মৃত্যু, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অভিযান এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রূপরেখাকেন্দ্রিক। জহির রায়হান এই চারটি প্রামাণ্যচিত্রের নামকরণ করেছিলেন 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র'। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জহির রায়হান, আলমগীর কবির এবং আরো কয়েকজন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা বাংলাদেশের জন্য 'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা' প্রণয়নের কথা চিন্তা করেছিলেন। জহির রায়হানের অন্তর্ধানের ১৫ বছর পর সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওবায়দুল হক, চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির প্রমুখের নেতৃত্বে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত 'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতি প্রণয়ন ওয়ার্কিং গ্রুপ' ১৯৮৮ সালের ১৩ই মে 'জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা'-র খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অগ্রসর চেতনার নির্মাতা ও গণমাধ্যম কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন বাঙালির চলচ্চিত্র-মুক্তিযুদ্ধে। ভারতীয় ফিল্মস ডিভিশন, বিবিসি, সিবিসি, এনবিসি, সিবিএস, এবিসি, গ্রেনাডা টেলিভিশন সে সময় অনেক তথ্যচিত্র ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রদর্শন করে। বিদেশি চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে ভারতীয় নির্মাতা কলকাতার উমাপ্রসাদ মৈত্র প্রথম নির্মাণ করেন *জয় বাংলা*, বোম্বের আই. এস. জোহর হিন্দি ভাষায় নির্মাণ করেন *জয় বাংলাদেশ* (ছবিটি বর্তমানে নিষিদ্ধ), সুকদেব এবং তপন ঘোষ নির্মাণ করেন *নাইন মান্থস টু ফ্রিডম*, ঋত্বিক ঘটক নির্মাণ করেন *দুর্বার গতি পদ্মা*, গীতা মেহতা নির্মাণ করেন *ডেটলাইন বাংলাদেশ* এবং দূর্গাপ্রসাদ নির্মাণ করেন *দুরন্ত পদ্মা*। গ্রেনাডা টেলিভিশনের পক্ষে ভানিয়া কাউল নির্মাণ করেন *মেজর খালেদ'স ওয়ার: সম্মুখ সমরে*।[৩] মার্কিন চলচ্চিত্রকার লিয়ার লেভিন *জয়বাংলা* ছবি নির্মাণ এবং *মুক্তির গান* চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ *মুক্তির গান* (১৯৯৫) চলচ্চিত্রের সেই ফুটেজ উদ্ধার করেন আমেরিকা থেকে এবং পরে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন। এরপর তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণের বক্তব্য ধারণ করে নির্মাণ করেন *মুক্তির কথা*। এনবিসি'র পিটার রজার্স নির্মাণ করেন *দ্য কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার*। জাপানি প্রথাবিরোধী নির্মাতা নাগাশি ওশিমা নির্মাণ করেন– *রাহমান: ফাদার অব বেঙ্গল*, *বাংলাদেশ স্টোরি* এবং দেশ গঠনের প্রেক্ষাপটে *জয়বাংলা* শীর্ষক চলচ্চিত্র। এছাড়া আরো অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয় সে সময়।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে আলমগীর কবির তৈরি করেন আরো ৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: *পোগ্রম ইন বাংলাদেশ*, *এক সাগর রক্তের বিনিময়ে*, *বাংলাদেশ ডায়েরি* এবং *লং মার্চ টুওয়ার্ডস গোল্ডেন বাংলা*। পরবর্তীতে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়কে উপজীব্য করে একই ধারায় আরো বিপুল পরিমাণ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।[৪]

বাণিজ্যিক ধারায় স্বাধীনতার পর নির্মিত হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র– *ওরা এগারো জন* (১৯৭২), *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২), *জয়বাংলা* (১৯৭২), *রক্তাক্ত বাংলা* (১৯৭২), *বাঘা বাঙালি* (১৯৭২), *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩), *আমার জন্মভূমি* (১৯৭৩), *আবার তোরা মানুষ হ* (১৯৭৩), *আলোর মিছিল* (১৯৭৪), *সংগ্রাম* (১৯৭৪), *বাংলার ২৪ বছর* (১৯৭৪), *মেঘের অনেক রং* (১৯৭৬), *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৯৭) প্রভৃতি।[৫]

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথাগত বাণিজ্যিক ধারার বাইরেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনানির্ভর এক স্বতন্ত্র ধারার উন্মেষ লক্ষ করা যায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে। এ সময়ের তরুণ নির্মাতারা পর্দায় আবারো ফিরিয়ে আনেন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট *আগামী* (১৯৮৪), *হুলিয়া* (১৯৮৫), *ধূসর যাত্রা* (১৯৯২), *একাত্তরের যীশু*, *একজন মুক্তিযোদ্ধা*, *একাত্তরের লাশ*, *মুক্তির গান* (১৯৯৫), *আগুনের পরশমণি* (১৯৯৪), *সেই রাতের কথা বলতে এসেছি* (২০০৩), *ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ* (২০০৯), *জয়যাত্রা (২০০৪)*, *শ্যামলছায়া (২০০৪)*, *খেলাঘর (২০০৮)*, *রাবেয়া* (২০০৯), *নিঃসঙ্গ সারথি* (২০১০), *আমার বন্ধু রাশেদ* (২০১১), *মুক্তিযুদ্ধ '৭১* (২০১১) প্রভৃতি প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে।

মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, দেশভাগ, নারীমুক্তি, নতুন সমাজ নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে– *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩), *লাঠিয়াল* (১৯৭৫), *সূর্যকন্যা* (১৯৭৬), *পালঙ্ক* (১৯৭৬), *সুপ্রভাত* (১৯৭৬), *সূর্যগ্রহণ* (১৯৭৬), *সীমানা পেরিয়ে* (১৯৭৭), *বসুন্ধরা* (১৯৭৭), *গোলাপি এখন ট্রেনে* (১৯৭৮), *সারেংবৌ* (১৯৭৮), *সূর্য দীঘল বাড়ি* (১৯৭৯), *রূপালি সৈকতে* (১৯৭৯), *সূর্যসংগ্রাম* (১৯৭৯) এসব চলচ্চিত্রে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দেশীয় চলচ্চিত্রে এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, চলচ্চিত্র হয়ে উঠতে চাইছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় পুষ্ট।

বঙ্গবন্ধু, ৩রা এপ্রিল ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের ইতিহাসে ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিলের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে দিবসটি বাংলাদেশে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে পালিত হয়। পাকিস্তানি শাসনামলের ঐ দিনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে প্রাদেশিক আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (ইপিএফডিসি) বিল উত্থাপন করেন এবং সামান্য সংশোধনীর পর বিলটি অনুমোদিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলেই সেদিন ঢাকায় এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন' বা সংক্ষেপে 'বিএফডিসি' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে।

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ১১ দফার উন্মেষ ঘটে। এ সময়েই বাংলাদেশের 'রাজনীতির

কবি' শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির শোষণমুক্তির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। রাজনীতি এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন এমন গুণগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, ঢাকার চলচ্চিত্রেও তখন শুরু হয় আত্মপরিচয়ের স্বরূপ সন্ধান। নির্মাতারা ও দর্শকসমাজ সেদিন চলচ্চিত্রের প্রতি বিপুল সাড়া দিয়েছিলেন সম্মিলিতভাবে। শুধু চলচ্চিত্র নির্মাণ ও দর্শকপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে নয়– সেদিন প্রকাশনা, গণমাধ্যম, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও বাঙালি চিন্তাবিদরা সোচ্চার হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।

এ বছর পালিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। এ উপলক্ষে জাতির পিতার জীবন, কর্ম, স্মৃতি ও বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অপরিসীম ভূমিকা নিয়ে তৈরি হচ্ছে শত শত চলচ্চিত্র। ভারতের বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগালকে দিয়ে নির্মাণ করানো হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক বিশ্বমানের চলচ্চিত্র। এসবও প্রকৃত অর্থে আমাদের চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

চলচ্চিত্রে সুস্থ নির্মাণ ও মুক্তিযুদ্ধের ধারা অব্যাহত থাকলে আমরা হয়ত এতদিনে বাংলাদেশের 'জাতীয় চলচ্চিত্রের' সন্ধান পেয়ে যেতাম। কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশে যেখানে এফডিসি থেকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১২টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়,[৬] সেখানে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকে পরবর্তী ৩০ বছরে নির্মিত হয় মাত্র ৭টি চলচ্চিত্র।

চলচ্চিত্রে নতুন চিন্তা ও নতুন প্রযুক্তি

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের তরুণ নির্মাতারা নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারা উৎসাহী হন নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে। অর্থ সংকটের কারণে তারা বিকল্প পদ্ধতিতে ১৬ মিমি. ফরমেটে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের পটভূমিতে এ ধারা দেশে অনেক নান্দনিক ও ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছে। এ সময়ের তরুণ নির্মাতারা পর্দায় আবারো বিপুলভাবে ফিরিয়ে আনেন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তাদের প্রথাবিরোধী চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে।[৭] পাশাপাশি বাণিজ্যিক ধারার ভেতর থেকেও সৃজনশীল অনেক চলচ্চিত্রকার দেশে উন্নত রুচির অনেক ছবি হাজির করেছেন দর্শকদের দুয়ারে। নবীন ও প্রবীণরা দেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনের অন্ধকারের বিরুদ্ধে যেন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে।[৮]

অনেকেরই হয়ত জানা আছে, জার্মান চলচ্চিত্রের দৈন্যদশা কাটাতে ১৯৬২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ওবারহাউজেন শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভালের ঘোষণা ছিল – পুরনো চলচ্চিত্র এখন মৃত, আমরা বলছি নতুন চলচ্চিত্রের কথা।[৯] এ ঘোষণার ফলাফল হলো জার্মানির আজকের দিনের নতুন চলচ্চিত্রধারা। ক্রমান্বয়ে এই চেতনা বিশ্বব্যাপী নির্মাতাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই ডিজিটাল চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু। এর সাথে যুক্ত হয় নতুন দিনের নতুন আবিষ্কার ও নতুন প্রযুক্তি। আমরা আজ লক্ষ করছি বাংলাদেশসহ পৃথিবীব্যাপী নির্মাতাদের মধ্যে সাম্প্রতিক প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সেলুলয়েডে নির্মিত চলচ্চিত্র ধারার বিপরীতে আমাদের দেশে এখন ডিজিটাল ফরমেটে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে।

বাংলা চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা

মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের চলচ্চিত্রকাররা বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। অনেক চলচ্চিত্রকার ও শিল্পী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে দেশের পতাকাকে বিদেশে উড্ডীন করেছেন। চলচ্চিত্রে নতুন নির্মাতা, শিল্পী ও কুশীলবদের উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রাজধানী ঢাকায়, এমনকি বিভাগীয় এবং জেলা শহরে এখন প্রতিবছর একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেশে স্বাধীন উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে স্বল্প ও মুক্তদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং বিজ্ঞাপন, তথ্য, কাহিনি ও প্রামাণ্যচিত্র। শিশুরাও অনেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে। অনেকে মোবাইল ফোন দিয়ে শুট করেও চলচ্চিত্র বানিয়ে ফেলছেন। দেশে প্রতিবছর জেলা পর্যায় পর্যন্ত শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মোট কথা সবাই মনের কথা পর্দায় উপস্থাপন করতে চাইছেন। বাংলাদেশের নির্মাতাদের জন্য একটি বড়ো ভরসার জায়গা হলো এদেশে ১৬ কোটি মানুষের এক বিশাল

অভ্যন্তরীণ বাজার রয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে আরো প্রায় ২০ কোটি বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি প্রবাসী নাগরিকও রয়েছেন এর মধ্যে। বাংলাদেশের ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ ও ভাষা আন্দোলনের স্মারক 'অমর একুশে'

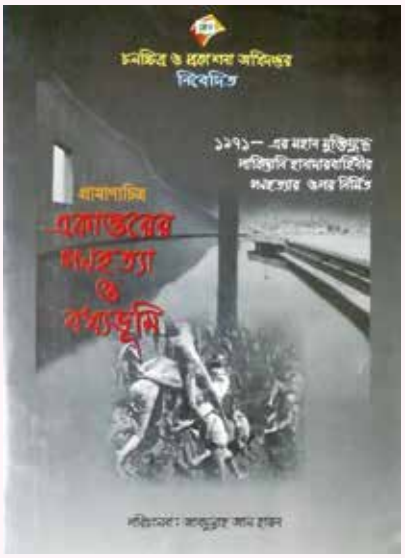

এখন জাতিসংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হওয়ায় সারা বিশ্বের দৃষ্টি এখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে। এমনকি বাংলা ভাষার জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই বাংলা চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের এখন নতুন পৃথিবীর সকল সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই নতুন দিনের চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে। বিদেশে দেশীয় চলচ্চিত্র প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক 'বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব'সহ বহুমুখী তৎপরতা চালানোর বিষয়ও চিন্তা করা যেতে পারে। উন্মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে দেশীয় চলচ্চিত্র আজ কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে আমাদের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে। এজন্য সুস্থ চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতার কোনো বিকল্প নেই। ভালো ছবির ব্যাপারে ইতিবাচক প্রচারণা এবং খারাপ ছবির বিপক্ষে সামাজিক প্রতিরোধ তৈরিতে গণমাধ্যমকে হতে হবে সোচ্চার, সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান দেশে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে এবং এ শিল্পে শিক্ষিত, সৃজনশীল, মেধাবী ও দেশপ্রেমিকদের এগিয়ে আসতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। পুঁজির সংকট নিরসনে বিত্তবান সম্প্রদায়কে এ শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ অনুপম হায়াৎ, ১৯৮৭: *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা, ঢাকা, (পৃ. ২৭৬-২৭৭)।

২ ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, ২০১৩, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, (পৃ. ৩০)।

৩ মোঃ নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ, 'মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ', মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পাদিত), ২০০৪: *রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা ও মানজারে হাসিন মুরাদ (২০১২), *প্রাগুক্ত*।

৪ *দশ মিনিটের সংবাদ চিত্র* (১৯৭২), *ডায়রিজ অব বাংলাদেশ* (১৯৭২), *দেশে আগমন* (১৯৭২), *Long March Towards Golden Bangla* (১৯৭৪), *মুক্তিযোদ্ধা* (১৯৭৬), *বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ* (১৯৮৩), *বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর* (১৯৮৩), *বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান* (১৯৮৪), *জেনারেল এম এ জি ওসমানী* (১৯৮৪), *বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান* (১৯৮৪), *বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন* (১৯৮৪), *বীরশ্রেষ্ঠ মুনশী আবদুর রউফ* (১৯৮৫), *বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল* (১৯৮৫), *এক সাগর রক্তের বিনিময়ে* (১৯৮৫), *স্মৃতি একাত্তর* (১৯৯১), *মুক্তির গান* (১৯৯৫), *চারুকলায় মুক্তিযুদ্ধ* (১৯৯৭), *মুক্তির কথা* (২০৯৮), *কামালপুরের যুদ্ধ* (২০০১), *মৃত্যুঞ্জয়ী* (২০০১), *প্রতিকূলের যাত্রী* (২০০১), *সেই রাতের কথা বলতে এসেছি* (২০০২), *স্বাধীনতা* (২০০২), *ফিনিক্স* (২০০৩), *প্রিয়ভাষিণী* (২০০৩), *মুক্তিযোদ্ধা আমরাও* (২০০৩), *তাজউদ্দীন: নিঃসঙ্গ সারথী* (২০০৭), *আমি স্বাধীনতা এনেছি* (২০০৭), *অনেক কথার একটি কথা* (২০০৭), *অন্য মুক্তিযোদ্ধা* (২০০৭), *কালরাত্রি* (২০০৭), *১৯৭১* (২০১১)।

৫ **১৯৭০-এর দশক:** *রক্তাক্ত বাংলা* (১৯৭২), *বাঘা বাঙালি* (১৯৭২), *জয় বাংলা* (১৯৭২), *কার হাসি কে হাসে* (১৯৭৪), *মেঘের অনেক রঙ* (১৯৭৬)। **১৯৮০-এর দশক:** *বাঁধন হারা*, *চিৎকার*। **১৯৯০-এর দশক:** *আমরা তোমাদের ভুলবো না* (১৯৯৩), *সিপাহী* (১৯৯৪), *আগুনের পরশমণি* (১৯৯৪), *নদীর নাম মধুমতি* (১৯৯৫), *মুক্তির গান*, *এখনো অনেক রাত* (১৯৯৭), *হাঙ্গর নদীর গ্রেনেড* (১৯৯৭), *মুক্তির কথা*। **২০০০-এর দশক:** *ইতিহাস কন্যা* (২০০০), *একজন মুক্তিযোদ্ধা* (২০০১), *শিলালিপি* (২০০২) *মাটির ময়না* (২০০২), *জয়যাত্রা* (২০০৪), *শ্যামল ছায়া* (২০০৪), *মেঘের পরে মেঘ* (২০০৪), *ধ্রুবতারা* (২০০৬), *খেলাঘর* (২০০৬), *অস্তিত্বে আমার দেশ* (২০০৭), *স্পার্টাকাস একাত্তর* (২০০৭)। **২০১০-এর দশক :** *গেরিলা* (২০১১), *মেহেরজান* (২০১১), *খণ্ডগল্প ১৯৭১* (২০১২), *নিঝুম অরণ্যে*, *পিতা* (২০১২), *জীবনঢুলী* (২০১৩), *৭১-এর গেরিলা* (২০১৩), *৭১-এর সংগ্রাম* (২০১৩), *মেঘমল্লার* (২০১৪), *অনুক্রোশ* (২০১৪), *হৃদয়ে-৭১* (২০১৪), *৭১-এর মা জননী* (২০১৪), *যুদ্ধশিশু* (২০১৪), *শোভনের স্বাধীনতা* (২০১৫), *এইতো প্রেম*, *অনিল বাগচীর একদিন* (২০১৫), *বাপজানের বায়োস্কোপ* (২০১৫), *রূপসা নদীর বাঁকে* (২০২০)।

৬ দেখুন মোঃ নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ, 'মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ', মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সম্পাদিত), ২০০৪: *রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা। (পৃ. ৩২৫-৩৩৩)।

৭ *আগামী* (১৯৮৪), *হুলিয়া* (১৯৮৫), *চাক্কি* (১৯৮৫), *প্রত্যাবর্তন* (১৯৮৬), *সূচনা* (১৯৮৮), *ছাড়পত্র* (১৯৮৮), *বখাটে* (১৯৮৯), *দুরন্ত* (১৯৮৯), *পতাকা* (১৯৮৯), *একজন মুক্তিযোদ্ধা* (১৯৯০), *কালোচিল '৭১* (১৯৯০), *ধূসর যাত্রা* (১৯৯২), *বাংলা মায়ের দামাল ছেলে* (১৯৯৭), *গৌরব* (১৯৯৮), *শোভনের একাত্তর* (২০০০), *শরৎ '৭১* (২০০০), *মুক্তিযুদ্ধ ও জীবন* (২০০০), *একাত্তরের মিছিল* (২০০১), *একাত্তরের রং পেন্সিল* (২০০১), *হৃদয় গাঁথা* (২০০২), *যন্ত্রণার জঠরে সূর্যোদয়* (২০০৪), *নরসুন্দর* (২০১০), *দুর্জয়* (২০১০), *নীল দংশন* (২০১০), *দ্য অ্যাডভেঞ্চারার* (২০১৪)।

৮ ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, ২০১০: 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্প বিকাশের পটভূমি ও আগামী দিনের প্রত্যাশা', *জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০০৮* (স্মরণিকা), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, (পৃ. ১৪-২৩)।

৯ ফাহমিদুল হক, ২০১২: *বাংলাদেশের ডিজিটাল চলচ্চিত্র নতুন সিনেমার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা (পৃ. ১১)।

লেখক: কবি, গ্রন্থকার, চলচ্চিত্রকার, গবেষক ও সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

মুজিব জন্মশতবর্ষঃ জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন

মুহঃ সাইফুল্লাহ

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশ-বিদেশে বছরব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারির করাল গ্রাসে মুজিববর্ষের এ কর্মসূচি অনেকটাই সীমিত করতে হয়। জাতির পিতাকে স্মরণ করে জাতীয় সংসদে একটি বিশেষ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল মার্চেই। করোনা ভাইরাসের কারণে সে অধিবেশন পিছিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ৫ই থেকে ১৫ই নভেম্বর ২০২০। এতে জাতির পিতার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, কর্ম, আদর্শ ও দর্শনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। ৯ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের ভাষণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ অধিবেশন শুরু হয়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সংসদ কার্যবিধির ১৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংসদে সকল দলের সংসদ সদস্যদের পাঁচ কর্ম দিবসের আলোচনায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী উত্থাপিত প্রস্তাব ১৫ই নভেম্বর কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপতি ৯ই নভেম্বর ২০২০ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তাঁর ভাষণে বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। এই দুই সত্তাকে আলাদাভাবে দেখার চেষ্টা যারা করেছেন, তারা ব্যর্থ হয়েছেন। আজকের বাস্তবতা এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, বঙ্গবন্ধু একটি প্রতিষ্ঠান, একটি সত্তা, একটি ইতিহাস। জীবিত বঙ্গবন্ধুর মতোই অন্তরালের বঙ্গবন্ধু শক্তিশালী। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি থাকবে, এদেশের জনগণ থাকবে, ততদিনই বঙ্গবন্ধু সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে তিনি বিশ্বকে করেছেন আলোকময়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে বঙ্গবন্ধুর নীতি, আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বেড়ে উঠতে পারে, সে লক্ষ্যে সবাইকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

যারা দেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন ঐক্য। জনগণের ঐক্য, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ঐক্য। যে ঐক্য একাত্তরে আমাদের এক করেছিল, সে ঐক্যই গড়ে তুলতে হবে সাম্প্রদায়িকতা, অগণতান্ত্রিকতা, অসহিষ্ণুতা ও হিংসার বিরুদ্ধে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৯ই নভেম্বর ২০২০ জাতীয় সংসদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেন- পিআইডি

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। যারা বাস্তবকে অস্বীকার করে কল্পিতকাহিনি ও পরিস্থিতি বানিয়ে দেশের সরলপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে, দেশের শান্তি অগ্রগতির ধারাকে ব্যাহত করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে একাত্তরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই প্রতিষ্ঠিত হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, সার্থক হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তাব উত্থাপনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন দেশ, লাল-সবুজ পতাকা ও সংবিধান উপহার দিয়েছেন। বিশ্বসভায় বাঙালিকে আত্মপরিচয় দিয়ে গর্বিত জাতি রূপে মাথা উঁচু করে চলার ক্ষেত্র রচনা করেছেন। স্বাধীনতার পর একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার জন্য মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ের মধ্যেই দেশের উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন।

সংসদ নেতা বলেন, ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা নির্মমভাবে নিহত না হলে বাংলাদেশ বহু আগেই উন্নত দেশে পরিণত হতো। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থেকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে পারাকে সৌভাগ্য হিসেবে বর্ণনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এজন্য তিনি জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। বঙ্গবন্ধুর হত্যা পরবর্তী বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক সময় বঙ্গবন্ধুর নাম এবং ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁর অবদান ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়। তিনি বলেন, এমনকি ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। সে ঐতিহাসিক ভাষণ এখন বিশ্ব প্রামাণ্য হেরিটেজ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতিহাস মুছে ফেলা সহজ নয়, ইতিহাসও প্রতিশোধ নেয়। তিনি বলেন, এখন থেকে আর কেউ ইতিহাস থেকে সেই নাম (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) মুছতে পারবে না, এটাই বাস্তবতা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা*, *আমার দেখা নয়া চীন* পড়ে জনগণ প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবে। *পাকিস্তানি ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট অন ফাদার অব দ্য ন্যাশন* থেকেও প্রকৃত ইতিহাস জানা যাবে। প্রধানমন্ত্রী জানান, *স্মৃতিকথা* শিরোনামে জাতির পিতার লেখা আরেকটি বইয়ের প্রকাশের কাজ চলছে।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতা বিশ্বাস করতেন দেশের মানুষ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসে এবং তারা তাঁকে মারতে পারবে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, বাঙালি জাতি জাতির পিতার সে বিশ্বাস রক্ষা করতে পারেনি।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু (মৃত্যুর আগে) বিশ্বাসঘাতকদের দেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু পেছনের ষড়যন্ত্রকারীদের তিনি দেখে যেতে পারেননি। তিনি বলেন, বিরাট সংখ্যক নয়, গুটিকয়েক ব্যক্তি এ ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানি জেল থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন দেশে ফিরে প্রথম ভাষণে জাতির পিতা দেশবাসীকে বলেছিলেন, 'ষড়যন্ত্র চলছে, ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে'। কিন্তু তারা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকতে ব্যর্থ হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর আদর্শ, তাঁর প্রতিটি কথা, বাক্য আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলো আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। দুঃখ, দুর্দশা দূর করে দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে জাতির পিতার আজন্ম স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সংসদে তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, ফকির মজনু শাহ, তিতুমীরসহ অনেকেই স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হননি। কেবল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই সফল হয়েছেন এবং আমাদের একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন।

সংসদে বঙ্গবন্ধুর ওপর আলোচনার দ্বিতীয় দিনে (১০ই নভেম্বর) জ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু ৩৫ দিনে ৩২টি জনসভা করেছিলেন। এসময় ৮ বার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তোফায়েল আহমেদ বলেন, এই পৃথিবীতে অনেক নেতা আসবেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো আর কোনো নেতা আসবেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ নেতা। তিনি মৃত্যুবরণ করেননি, তিনি আছেন, থাকবেন।

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন, ৬ দফা বঙ্গবন্ধুকে একক নেতায় পরিণত করেছিল। তিনি কেবল একটি দলের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশের নেতা, মানুষের নেতা। তিনি শুধু আওয়ামী লীগের নেতা নন, তিনি জাতির জনক।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, খুনিরা বুঝেছিল, বঙ্গবন্ধুর রক্তের ছিটেফোঁটাও যদি থাকে, তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াবে। এ কারণে তারা শিশু রাসেলকে পর্যন্ত ক্ষমা করেনি, কাউকেই রেহাই দেয়নি। সৌভাগ্যক্রমে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধুর অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তৃতীয় দিনের (১১ই নভেম্বর) আলোচনায় অংশ নিয়ে ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান।

সংসদ সদস্য আবদুল মতিন খসরু কমিশন গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের 'মাস্টারমাইন্ড'দের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের নামের সাথে ব্রিগেডিয়ার বা কর্নেল-এর মতো র‍্যাংক ব্যবহার না করার কথা বলেন।

মুজিববর্ষে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনের চতুর্থদিনের (১২ই নভেম্বর) আলোচনায় আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু এমপি বলেন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রে নিহত বঙ্গবন্ধু তাঁর সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু একটি পতাকা, একটি আন্দোলন, একটি বিপ্লব, একটি ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু একজন রাজনীতির কবি এবং ইতিহাসের একজন মহানায়ক। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বিশ্বের সবচেয়ে মেধাবী রাজনীতিবিদ এবং 'স্ট্র্যাটেজিস্ট'। তিনি সকল বাঙালিকে এক একজন মুজিবে পরিণত করেছিলেন।

সংসদে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মশিউর রহমান রাঙা বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের ভয়াবহ ঘটনা। এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পুরো জাতি অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। যদিও খুনিদের বিচার হয়েছে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পেছনের কুশীলবরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর রাজাকার-আলবদরদের স্থান এ সংসদে হবে না, এ দেশের কোথাও হবে না।

বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ মুজিববর্ষের বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতাকালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছার একটি লেখা পাঠ করেন যেখানে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে হারুনুর রশীদ বলেন, ২৫শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তিনি যদি পালিয়ে যেতেন বা ভারতে আশ্রয় নিতেন, তাহলে তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা বলা হতো। বিএনপি নেতা বলেন, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান যে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ আলোচনার শেষ দিনে (১৫ই নভেম্বর) তাঁর বক্তৃতায় বলেন, যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, তারাই ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্বকালে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধুর দর্শন ধারণ করে তাঁর হাতে রচিত ১৯৭২-এর সংবিধানের ভিত্তিতেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হবে।

সংসদে কণ্ঠভোটে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রস্তাব পাসের ঠিক আগে পঞ্চম দিনে (১৫ই নভেম্বর) আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ-বাকশাল গঠন করেন। কিন্তু পুরো ধারণাটা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। সংসদ নেতা বলেন, সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়নে জাতির পিতা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি সংবিধান সংশোধন করেন এবং ৫ বছরের কর্মসূচি হাতে নেন। শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার বিশ্বাস, তিনি যদি সে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারতেন, আজ বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁকে তা করতে দেওয়া হয়নি।'

যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন থাকবে বঙ্গবন্ধুর নাম। জাতি যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করবে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে জাতীয় সংসদের এ বিশেষ অধিবেশন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ইতিহাসে প্রথম বিশেষ অধিবেশন যা একাদশ জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশন। এর আগে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন আর হয়নি। তবে, দুটি বিশেষ বৈঠকের কথা জানা যায়। ১৯৭৪ সালের ৩১শে জানুয়ারি ও ১৮ই জুন অনুষ্ঠিত সংসদের বিশেষ বৈঠকে ভাষণ দেন যথাক্রমে তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল জোসেফ ব্রোজ টিটো এবং ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি।

লেখক: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

১৯৭১-এর অক্টোবর-নভেম্বরে রণাঙ্গন বুলেটিনে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় বার্তা

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানের বর্বর হানাদার বাহিনী কালো থাবা বিস্তার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ ও অসহায় বাঙালির ওপর। শুরু হয় গণহত্যা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন। এর পরেই বঙ্গবন্ধুকে আটক করে পাকিস্তানের কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে আর বাঙালির ওপর চালাতে থাকে পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতা। নিষ্ঠুরতার হাত থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেউই রেহাই পায়নি। বাঙালি এই বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। হাজার হাজার বাঙালি শরণার্থী হয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে চলে যায়। ভারত মানবিক কারণে বাঙালিদের আশ্রয় দেয় এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করে। ভারতের সহযোগিতায় এক দুর্বার প্রতিরোধ শুরু হয়। সংগঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিরোধের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শুরু হয় গেরিলা যুদ্ধ। ক্রমে সংগঠিত যুদ্ধের মাধ্যমে হানাদার বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের চূড়ান্তরূপ বা বিজয়ের বার্তা আসতে থাকে ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে। অক্টোবর-নভেম্বরে তা আরো প্রবল ও বেগবান হয়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে যুদ্ধের সাফল্য এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজয়ের যে চিত্র, তা আমাদের বিজয় এবং স্বাধীনতার প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করেছে। তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো–

২৩শে অক্টোবর স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিবাহিনী খুলনা জেলার আশাশুনি এলাকায় একটি রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে ৬৪ জন রাজাকার খতম এবং ৪০ জনকে মারাত্মকভাবে জখম করে। এ সময় তাঁরা ৫টি রাইফেলও দখল করে। একই দিনে তাঁরা খুলনা জেলার পাটকেলঘাটায় হানাদার বাহিনীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ১৫ জন খানসেনা হত্যা করে। এছাড়াও তাঁরা খুলনার শ্যামনগর এবং বাটশালা এলাকায় খানসেনাদের ওপর পৃথক আক্রমণ চালিয়ে ১১ জন পাকিস্তানি সৈন্যকে খতম করে। এর আগে ২৪শে অক্টোবর একই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর হাতে পাঁচজন অনিয়মিত শত্রুসেনা খতম হয়।

ঢাকা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম *রণাঙ্গন* থেকে জানা গিয়েছিল যে ২৬শে অক্টোবর ১৯৭১ সালে ছাগলনাইয়ায় মুক্তিবাহিনী মাইনের সাহায্যে একটি পাকিস্তানের ট্রাক ধ্বংস করে। ওই আক্রমণে পাকবাহিনীর সাতজন নিয়মিত সৈন্য ও পাঁচজন অনিয়মিত সৈন্যকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হন। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, উক্ত এলাকায় বেশ কয়েকদিন ধরে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা অব্যাহত থাকে। ময়মনসিংহ-সিলেট *রণাঙ্গন* থেকে জানা গিয়েছিল যে, অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ময়মনসিংহ জেলার নকলা, নলিতাবাড়ী, পূর্বধলা এবং দুর্গাপুর থানায় কয়েকটি উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে দশজন অনিয়মিত সৈন্য খতম করে এবং বেশ কিছু সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে।

রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী *রণাঙ্গন* থেকে জানা গিয়েছিল, ২৭শে অক্টোবর জগতপুর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সৈন্যদের

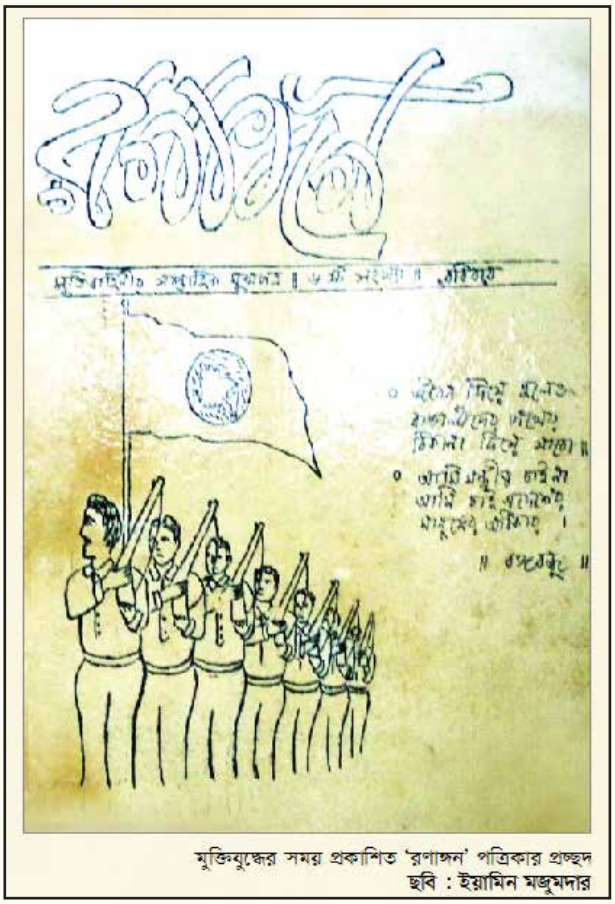

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকাশিত 'রণাঙ্গন' পত্রিকার প্রচ্ছদ
ছবি : ইয়ামিন মজুমদার

একটি মিশ্র টহল দলের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে এবং নয় জন শত্রুসেনা খতম ও চার জনকে আহত করেন।

২৮শে অক্টোবর মুক্তিসেনারা ধলাই চা বাগানে অবস্থানরত শত্রু সৈন্যের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে একজন ক্যাপটেনসহ ২১ জন শত্রু সৈন্য তদুপরি বহু অনিয়মিত সৈন্য নিহত হয়। এ যুদ্ধে আমাদের তিনজন বীর যোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হন।

২৯শে অক্টোবর ঠাকুরকোনার নিকটে পাক টহল দলের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা দুইজন নিয়মিত, চারজন অনিয়মিত শত্রু সৈন্য হত্যা করতে সমর্থ হন। ঐদিন মুক্তিবাহিনী জামালপুর ও বাহাদুরাঘাটের মধ্যবর্তী এলাকায় রেললাইন উড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। তাঁরা ওই সময় পাহারারত দুইজন রাজাকারকে জীবিত অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন।

৫ই নভেম্বর ফুলবাড়িয়া থানাতে হানাদার সেনাদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর একটি শক্তিশালী স্কোয়াডের ৬ ঘণ্টা স্থায়ী এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে হানাদাররা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে পিছনে হেঁটে যেতে বাধ্য হয়।

১১ই নভেম্বর মুক্তাগাছার বটতলায় মুক্তিবাহিনী এক যুদ্ধে তিনজন পাঞ্জাবি হানাদার সৈন্যসহ ৩ জন রাজাকারকে হত্যা করে এবং সাতজন রাজাকারকে গ্রেপ্তার করে।

১৩ই নভেম্বর নবাবগঞ্জ শহরে উপকণ্ঠে ইসলামপুর, বাগডাঙ্গা, সুন্দরপুর, ছোটো কলকাতা, ইলশামারি, দেবনগর প্রভৃতি গ্রামগুলোতে মুক্তিবাহিনীর ও খানসেনাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। গ্রামবাসীরা মুক্তিবাহিনীকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। মুক্তিবাহিনী এখানে সফলতা লাভ করে।

১৫ই নভেম্বর নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়ায় পাকসেনাদের ওপর মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং পাঁচজন পাকসেনা নিহত করে।

রংপুর-দিনাজপুর-রাজশাহী রণাঙ্গন থেকে জানা গিয়েছিল, ১৬ই নভেম্বর মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী এলাকায় পাকসেনাদের ঘাঁটি অবরোধ করে এবং প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালায়। এতে ছয় জন পাকসেনা নিহত ও চারজন আহত হয়। এই সময়ে রাজশাহী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয়েছিল। এই এলাকার ফরিদপুর, আলাগলি, হাকিমপুর, রাধাকান্তপুর, পিরোজপুর, পুলিয়াডাঙ্গা, চিলমারী, সাহেবনগর প্রভৃতি সীমান্ত চৌকি থেকে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের সম্পূর্ণরূপে হটিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো এ সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ভেদ্য ঘাটিতে পরিণত হয়েছিল।

মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অসামান্য অবদান

১৭ই নভেম্বর ভোর পাঁচটা থেকে ঢাকা শহরে আকস্মিকভাবে কারফিউ জারি করে প্রতি বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালানো হয়। মুক্তিবাহিনীর বীরযোদ্ধারা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পাকসেনার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

১৮ই নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা কক্সবাজারের নিকটে একখানা পাক জঙ্গিবিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বাংলাদেশের অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা শহরটি দখলের চেষ্টা করলে হানাদাররা বাধা দেয়। ফলে সামনাসামনি তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড মারের মুখে পাক হানাদার যখন টিকতে না পেরে পিছু হটছে তখন এই জঙ্গিবিমানের সাহায্য নেওয়া হয়।

২১শে নভেম্বর যশোর, চিটাগাং ও সিলেট রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ ও পাকসেনাদের মধ্যে ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এই যুদ্ধে পাকসেনারা ট্যাংক ব্যবহার করে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণের মুখে তারা টিকতে না পেরে পশ্চাৎ অপসারণ করতে বাধ্য হয়। পাক সাঁজোয়া বাহিনীর এই বিপর্যয়ের ফলে পাক সামরিক জান্তার মনে শেষ বিজয়ের আশার প্রদীপের শিখাটিও যেন আস্তে আস্তে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে।

২৪শে নভেম্বর যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া-ফরিদপুর অঞ্চলের ৮০ ভাগ এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে এসেছিল।

২৫শে নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ঝিকরগাছা থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। ওই সময়ের ঝিকরগাছার সব জায়গায় বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল এবং এই সময় অন্তত ১০টি জেলা অর্থাৎ রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর প্রভৃতি জেলাগুলো সাত দিনের মধ্যে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছিল।

২৬শে নভেম্বর খুলনা-কুষ্টিয়া-রংপুর-দিনাজপুর-কুমিল্লা প্রভৃতি রণাঙ্গনে পাকবাহিনী যেরূপে মুক্তিফৌজের হাতে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল, ঠিক একইভাবে যশোরের উপকণ্ঠেও ছিল তারা বেসামাল। চার দিন ধরে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর মুক্তিফৌজ চৌগাছা দখল করে নিয়েছে। যশোর ক্যান্টনমেন্টমুখী মুক্তিবাহিনীর দুর্বার গতি ক্রমান্বয়ে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

২৮শে নভেম্বর ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনীকে বাংলাদেশের হিলি থেকে পিছু হটিয়ে দেন। এদিকে মুক্তিবাহিনী তুমুল লড়াইয়ের পর হিলির ১০ মাইল ভেতরে জয়পুরহাট শহরটিও মুক্ত করে নিয়েছেন। মুক্তিবাহিনীর হাতে সেখানে চারটি পাক ট্যাংক ঘায়েল হয়েছে।

৩০শে নভেম্বর মুক্তিফৌজের অভিযানে কুড়িগ্রাম নাগেশ্বরীতে এক বিরাট সাফল্য আসে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর বীর জওয়ানরা নাগেশ্বরীতে শত্রুসেনাদের তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং প্রায় ১০ দিন যাবৎ তাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই অভিযানে শত্রুসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তারা ইউনিফর্ম ত্যাগ করে সাদা পোশাকে কুড়িগ্রামের দিকে ছুটে পালায়। ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের যশোর ক্যান্টনমেন্ট মুক্তিযোদ্ধারা অবরোধ করে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধাদের চাপের মুখে পাকসেনারা ত্রাহি ত্রাহি রবে আকাশ ফাটাচ্ছিল।

এমনভাবে চলতে থাকল, বাংলাদেশ মুক্ত হওয়াটা যেন আর কয়েক দিনের ব্যাপার মাত্র। ইতোমধ্যে পাকসেনাদের ওপর মিত্রবাহিনী ও যৌথবাহিনীর প্রচণ্ড চাপ পড়তে থাকে। ডিসেম্বর মাস আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাক হামলার সমালোচিত জবাব দিলেন এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলেন। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল সম্প্রসারিত হয় এবং অধিকৃত বাংলার পরিসর সংকুচিত হয়ে আসে। অবশেষে মুক্তিবাহিনী ও যৌথবাহিনীর নেতৃত্বের কাছে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ লাভ করে একটি লাল-সবুজ পতাকা।

লেখক: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, গবেষক ও সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সম্যান্ট

সুফিয়া বেগম

PSA বা Public Service Announcement এমন একটি বাক্য বা বার্তা যা সুশোভিত, সংক্ষিপ্ত, যে বাক্যটি জনগণ সহজে বুঝবে এবং যা হবে আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক। একটি PSA-তে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকবে যা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে, শিক্ষিত করবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। তাই PSA সম্পর্কে বলা হয়েছে– It is a message summarized in a single decorative and dectarative sentence. PSA-এর ভাষা কেমন হবে? অবশ্যই সহজ-সরল যা এককথায় সহজবোধ্য, কার্যকর, আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয়।

PSA বা পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সমেন্টের উদ্দেশ্য মূলত জনগণকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে মেসেজ বা বার্তা দেওয়া। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একটি PSA সবগুলো মিডিয়া বা মাধ্যমের জন্য উপযুক্ত নয়। অডিও মাধ্যমে যে *PSA,* TV-এর জন্য প্রয়োজন হতে পারে অন্য PSA এবং প্রিন্টিং মিডিয়া বা সংবাদপত্রের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন PSA-এর প্রয়োজন। হয়ত PSA-এর উদ্দেশ্য একই থাকবে কিন্তু ফরমেট বা পদ্ধতি হবে ভিন্ন ভিন্ন।

PSA সারা দুনিয়া বদলে দিতে পারে না। তাই PSA সম্পর্কে বলা হয়- PSA 's are not going to change the world.

কার্যকরী ও অকার্যকরী PSA

Effective PSA বা কার্যকরী PSA-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য বার্তার গ্রহণযোগ্যতা। সুনির্দিষ্ট বিষয়ে, সুনির্দিষ্ট জনগণকে ভালো কিছুর দিকে উদ্বুদ্ধ করাই কার্যকরী PSA-এর মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। সুশোভিত, চিত্তাকর্ষক এই বার্তা উন্নয়ন যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম।

একটি অর্থহীন দীর্ঘ কথামালা যা জনগণের মাঝে অনাকর্ষণীয় ও অকার্যকর তা একটি BAD PSA। একটি BAD PSA কার্যকরী PSA-এর উলটো রূপ।

কার্যকরী বা Effective PSA-এর বৈশিষ্ট্য

ক. উদ্বুদ্ধকরণ
খ. আকর্ষণীয়
গ. যথেষ্ট অর্থবহ
ঘ. সংক্ষিপ্ত
ঙ. সংগতিপূর্ণ
চ. রাজনৈতিক স্লোগান হবে না
ছ. সময় উপযোগী
জ. জনপ্রিয়
ঝ. সহজবোধ্য।

BAD বা অকার্যকর PSA-এর বৈশিষ্ট্য

ক. দুর্বল চিন্তাচেতনা সংবলিত
খ. বিতর্কিত বিষয় সংবলিত
গ. আত্মকথন বা দলীয় রাজনৈতিক বক্তব্যে ঠাসা
ঘ. একটি *PSA* সব মাধ্যমের জন্য ব্যবহারের উপযোগী করে নির্মাণ করা
ঙ. অর্থহীন দীর্ঘকথামালা
চ. ভাষার দীনতা
ছ. চিত্তাকর্ষক নয়
জ. *PSA* নির্মাতারা নিজেরাই জানে না, যাদের জন্য বার্তা, তারা কতখানি জানে ?
ঝ. সময় উপযোগী নয়
ঞ. অনেক বার্তা এক *PSA*-তে দেবার প্রবণতা। *(Puts all eggs in one basket)*

কতিপয় জনপ্রিয় PSA

১. আঠারোর পরে হলে বিয়ে, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য মেলে
২. যদি পুষ্টি পেতে চান শাকসবজি বেশি খান
৩. বেশি করে আলু খান, ভাতের ওপর চাপ কমান
৪. পচা বাসি খাব না, মৃত্যু ঝুঁকি নেব না
৫. ফল খাই বল পাই, ফলের চারা তাই লাগাই
৬. কাজ শেষে, পানির কলটি বন্ধ রাখুন
৭. গ্যাস জাতীয় সম্পদ, এর অপচয় বন্ধ করুন
৮. আসবে শিশুর শুভ দিন, সময়মতো টিকা দিন
৯. আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব
১০. গাছের চারা লাগান পরিবেশ বাঁচান
১১. ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

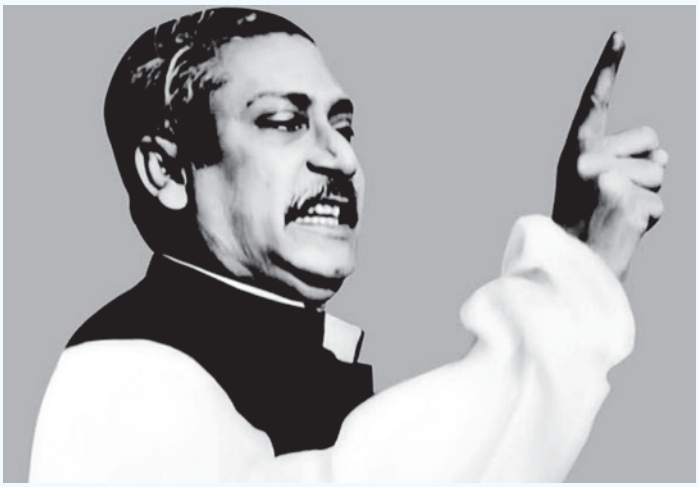

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজভাবনা

শাফিকুর রাহী

২০২১ সালে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এ আনন্দঘন দিনটিকে স্মরণীয় করতে সরকারি-বেসরকারিভাবে ব্যাপক কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। আত্মমর্যাদাশীল জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনার সঙ্গে মিল রেখে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বহুমুখী মহাকর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের কাজও দ্রুত এগিয়ে চলছে। বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা-সমাজভাবনা, একটি জাতিরাষ্ট্রের মানস গঠনে শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানেমানে নিজেকে বিকশিত করার যে মনোতাগিদ ছিল, তা তিনি রাজনীতির প্রথম পাঠে নানাভাবে গণমানুষের মাঝে সঞ্চারণ করতে সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ এক মহিমান্বিত রূপকল্পে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি বারবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। অনেক অমানবিক নির্যাতন সহ্য করেও তিনি কখনো দমে যাননি, বীরবেশে সব ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করেছেন আপন অহমে।

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়নে হয়েছেন ক্ষতবিক্ষত। আঘাতের পর আঘাত সয়ে গেছেন কিন্তু কখনো তিনি কোনো শত্রু পক্ষের সঙ্গে আপোশ করেননি। পাকিস্তানি জান্তাদের অপরাজনীতির নানা অপকর্ম-ষড়যন্ত্রের দুঃসহ দুর্গতিকালে বঙ্গবন্ধু ভাবতে শুরু করলেন বাংলার মুক্তিকামী দুখি মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কীভাবে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করা যায়; তার সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে তিনি গণমুখী কর্মসূচি প্রণয়নের পথে ধাবিত হলেন। বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীনের বহু আগেই এমন ভাবনাচিন্তায় গঠনমূলক কর্মপরিকল্পনায় গণমানুষকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হলেন। পাকিস্তানি জান্তাদের দুর্বিষহ দুঃশাসনের কবল থেকে বাঙালি জাতিকে কীভাবে রক্ষা করা যায়– সে ভাবনা থেকেই তাঁর মনোমাঠে ঘুরপাক খায় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র বিনির্মাণের চিন্তা।

তাঁর প্রথম কথা দেশের মানুষকে ভালোবাসার কথা, তাঁর শেষ কথা দেশের মানুষের ভালোবাসার কথা। তিনি শুরু করেছিলেন এমন চিন্তাভাবনা থেকেই। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রথম বিপ্লবের দুঃসাহসী অভিযানে ব্যাপকভাবে সফলতা অর্জন করলেও দ্বিতীয় অভিযান তাঁকে অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি। পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টে জাতিঘাতকদের হিংস্র থাবায় তাঁর দীর্ঘকালের লালিত স্বপ্ন ছারখার হয়ে গেল। এমন গূঢ় ও গভীরভাবে মানুষকে ভালোবাসার অমর কাব্যিক গর্বগাথা বিশ্বের কোনো নেতার দ্বারা সম্ভব হয়নি।

বঙ্গবন্ধু বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন– তাঁকে মারার জন্য পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী নানাভাবে ষড়যন্ত্র করেও ব্যর্থ হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, একজন নেতা যখন ন্যায়নীতি ও সত্য-সঠিক পথে তাঁর শুভবাদের দীপ্ত অভিযানে ধাবিত হয়, তখন যত জটিল ও কঠিন চ্যালেঞ্জই হোক না কেন, তিনি তা মোকাবিলায় সফলতা অর্জন করবেন। তিনি যখন যেটি ভালো মনে করেছেন সেটির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টায় কখনো ভুল করেননি বিধায় তিনি বঙ্গবন্ধু হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আবার সে বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা উপাধিতে এক নাক্ষত্রীয় প্রভায় উদ্ভাসিত হলেন বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নসারথি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার এক মানবিক খোকা শেখ মুজিবুর রহমান।

সমাজতন্ত্রের কালপুরুষ দার্শনিক কার্ল মার্কস বলেছেন, মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। অর্থ হলো পুঁজিপতিদের হাতে শ্রমিক শোষণের হাতিয়ার। আর বঙ্গবন্ধু বলেন, পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত– একটি শোষিত আরেকটি শাসিত। তিনি শোষিতের পক্ষে। একটি জনপদের গণমানুষের মুক্তির জন্য বীরবিক্রমে বলীয়ান হয়ে মানবিক মুক্তির এক নতুন ধারার বিপ্লবী অভিযানে নিজেকে সম্পৃক্ত করলেন মানুষের পরম ভালোবাসার মন্ত্রমুগ্ধ সম্ভাষণে ব্যাকুল হয়ে। তাঁর বিচক্ষণতা ও প্রাজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল প্রখরতায় জেগে ওঠে হাজার বছরের লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-অধিকারহারা অসহায় মানুষ। বঙ্গবন্ধু বিশুদ্ধ ভাবনার অতল গহ্বরে খোঁজেন তাঁর মনের গভীরে লুকানো ভালোবাসার মানুষগুলোকে। এ জনপদের সকল মানুষই তাঁর আপনজন, মানুষের প্রতি তাঁর এ অমূল্য ভালোবাসার জন্য তাঁকে নির্মমভাবে জীবন দিতে হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকদের হিংস্র থাবায়। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবে না।

তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা থেকে সমাজভাবনায় ছিল সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া জনসাধারণকে কীভাবে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা যায়; কারণ তাদের মধ্যে জাগরণ ঘটাতে না পারলে সে স্বাধিকার আন্দোলন কখনো সফলতার আলো দেখবে না। এটা সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন বলেই প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন। জনমানুষকে এভাবে অধিকার সচেতন করে গড়ে তোলার এক নজিরবিহীন ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে তিনি স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার স্বপ্নবপন করলেন একান্তই নিজস্ব নীতিতে অটল ও অভয় থেকে। সে গণজাগরণের মধ্য দিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করলেন রাষ্ট্র বিনির্মাণের চিন্তা ও সমাজ পরিবর্তনের দুঃসাহসী বিপ্লবী উপাখ্যানের ভেতর দিয়ে। বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই কিন্তু তাঁর মহান আদর্শ বাঙালি জাতিকে অনন্তকাল প্রেরণা জোগাবে যে-কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী করে তুলতে।

পাকিস্তান স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর নির্মমতার ভয়াবহচিত্র, লাখো শহিদের রক্তের দাগ তখনো শুকায়নি, এমতাবস্থায় চতুর্দিকে স্বজন হারানোর আহাজারি আর লাখো নির্যাতিত মা-বোনের অব্যক্ত কষ্টের রোদনধ্বনিতে কম্পিত যখন সমগ্র লোকালয়, তখনই বাংলার মহীয়সী নারী অধ্যাপক ড. নীলিমা ইব্রাহিম, কবি সুফিয়া কামাল সমাজকর্মী মালেকা খানকে বললেন যে, এসব অসহায় নির্যাতিত নারীদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে জানাতে হবে, তিনি অবশ্যই ওদের জন্য কিছু একটা করবেন। যে কথা সে কাজ। কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে এ বিষয়টি জানানোর পর তিনি মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র ইস্কাটনে এসে নিজ চোখে বিষয়টি দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। সেসব নারীদের মাঝ থেকে কেউ একজন বলতে লাগলেন যে, তাদের পিতারা কেউই আর তাদের পরিচয় দিতে চান না বিধায় তারা খুব অসহায় ও শঙ্কিত। একসঙ্গে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুকে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে একজন নারীর মাথায় হাত রেখে বঙ্গবন্ধু বললেন যে, আজ থেকে তোমরা তোমাদের নামের শেষে শেখ মুজিবুর রহমান লিখে দেবে এবং তোমরা বীর নারী– বীরাঙ্গনা।

এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জাতির পিতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। যদিও এর বাইরেও আরো অনেক দূরদর্শী কর্মকাণ্ডের বিরল নজির স্থাপনের গর্বিত ইতিহাস তাঁর রয়েছে। একজন প্রাজ্ঞ মনীষীর পরিচয় তিনি তাঁর সকল অমূল্য কর্মসৃজনের মধ্য দিয়ে বারবার প্রমাণ করেছেন। বিশ্বরাজনৈতিক নেতাদের মাঝে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের গৌরব রচনা করে হয়েছেন বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু। এমন খ্যাতি তো একমাত্র বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের মহামানবের ভাগ্যললাটেই অঙ্কিত করেছেন বিশ্ব ভাগ্যবিধাতা। বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের মহান নির্মাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কালে তো বটেই বর্তমান বিবর্তনশীল বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে আলোচনা করলেও দেখা যাবে, আজো তাঁর কাছাকাছি এমন কোনো প্রগতিশীল, উদার ও মহৎ নেতা বিরল।

কৃষকের ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যাপারে ভীষণ মনোযোগী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সে তাগিদ অনুভব করেই দেশ স্বাধীনের অল্প সময়ের মধ্যেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমিনের খাজনা মওকুফ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ রক্তেভেজা সুবর্ণ ভূমিতে ৮০ ভাগ মানুষই কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু কৃষকশ্রেণির ভাগ্য উন্নয়নে যা যা করা দরকার তাই করবেন বলে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সমাজের সকল অসঙ্গতি দূর করে একটি মানবিক রাষ্ট্র গড়ে তুলবেন। যে রাষ্ট্রে কিংবা সমাজে কোনো বৈষম্য থাকবে না, যে দেশের মানুষ জ্ঞানেমানে উন্নতির স্বর্ণচূড়ায় আরোহণ করবে।

পবিত্র হাদিসেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। আর মহান রাব্বুল আলামীনও তাঁর মহা ধর্মগ্রন্থ *কোরানের* একটি সূরায় ঘোষণা করেন যে, 'যে আমার বান্দাকে ভালোবাসে আমি তাকে ভালোবাসি'। আমরা যদি গভীরভাবে এ বিষয়টি লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধু কখনো ধর্ম-কর্মের বাইরে কোনো কথা কখনো ভুলেও বলেননি বরং তিনি ধর্ম প্রচারের পথকে আরো বেশি বিকশিত করার লক্ষ্যে বায়তুল মোকারম জাতীয় মসজিদের সঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তিনি কাকরাইলে অবস্থিত তাবলীগ-জামায়েতের প্রধান স্থানটির সরকারি জায়গার অনুমতি দিয়েছেন, তাছাড়া তুরাগ তীরে বিশ্ব এজতেমার জায়গাটি বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরেই অনুমোদন দেওয়া হয়।

বাঙালি জাতি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার সোনালি সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছে আপন জীবনকে বিসর্জন দেওয়ার এক অবিস্মরণীয় গৌরব রচনার ভেতর দিয়ে। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলতেন, আমরা প্রথম যুদ্ধে সফলতা অর্জন করেছি বহু রক্তের বিনিময়ে। আমাদের দ্বিতীয় যুদ্ধে শরিক হতে হবে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে। সেটি হলো দেশকে স্বনির্ভর করতে হলে এবং অর্থনৈতিকভাবে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রথমে জোর দিতে হবে কৃষির ওপর। আর আমরা যদি কৃষি বিপ্লব ঘটাতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারি তবে বিশ্বদরবারে একদিন আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো, ইনশাল্লাহ।

বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের সফলতা অর্জন হতে চলেছে তাঁরই সুযোগ্যকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদার মানবিক কর্মপ্রচেষ্টার ফলে। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। আমরা আশাবাদী, বঙ্গবন্ধুর চিরদিনের লালিত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন অচিরেই দেখতে পাবে দেশের জনগণ। সে স্বপ্ন ও সম্ভাবনার আলোর পথের অভিযাত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা তাঁর ধারাবাহিক উন্নয়ন-অগ্রগতির সোপান রচনা করে ইতোমধ্যেই বিশ্ববাসীকে চমকিত করেছেন। বাংলাদেশ এখন 'উন্নয়নের রোল মডেল'।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও ক্ষুদ্রপ্রাণ মুজিব সৈনিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন বিশ্ব সংস্থার কো-চেয়ার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের বিভিন্ন পর্যায়ের শীর্ষ নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত ওয়ান হেলথ গ্লোবাল লিডার্স গ্রুপ অন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স'র কো-চেয়ার মনোনীত হয়েছেন। জাতিসংঘের দুই সহযোগী প্রতিষ্ঠান খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এবং প্রাণীর রোগ প্রতিরোধে কাজ করা ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন ফর অ্যানিমেল হেলথের (ওআইই) যৌথ উদ্যোগে ২০শে নভেম্বর প্ল্যাটফর্মটির সূচনা হয়।

রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠা ঠেকাতে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সব কার্যকর ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে যাত্রা করা এ প্ল্যাটফর্মের কো-চেয়ার হিসেবে শেখ হাসিনার পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করবেন বার্বাডোসের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মোত্তেলিও। এছাড়াও এ গ্রুপে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান ও মন্ত্রী এবং বেসরকারি খাত ও নাগরিক সমাজের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা রয়েছেন।

বিশ্বজুড়ে পরিচিত এসব ব্যক্তিত্ব নিজেদের নেতৃত্ব এবং প্রভাব কাজে লাগিয়ে জীবাণু ধ্বংসে সক্ষম ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবেন। একইসঙ্গে জীবাণুর ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠার মারাত্মক পরিণতির বিষয়ে বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। এর পাশাপাশি 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স' মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ নিতে সহায়তাও দেবেন প্ল্যাটফর্মটির সদস্যরা। বিশ্বজুড়ে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ চলার মধ্যে যাত্রা শুরু করে প্ল্যাটফর্মটি। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বিষয়ক আন্তঃসংস্থা সমন্বয় গ্রুপের পরামর্শে এবং জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের সমর্থনে প্ল্যাটফর্মটি সৃষ্টি হয়।

প্রতিবেদন: মো. আসিফ

করোনাকালেও জনশক্তি রপ্তানি খাতে নতুন রেকর্ড

এম এ খালেক

একজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ব্যক্তিগত আলাপচারিতাকালে বলেন, 'বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে তার উর্বর মাটি এবং সৃজনশীল মানুষ। বাংলাদেশের মাটিতে বীজ পুঁতে রাখলেই ফলন পাওয়া যায়। আর বাংলাদেশের মানুষ এতটাই সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী যে তাদের যে-কোনো কাজেই নিয়োগ দেওয়া হোক না কেন তারা সেই কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম'। তিনি আরো বলেন, 'দেখবেন, একদিন বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হবে এর সৃজনশীল জনশক্তি'। অর্থনীতিবিদের সেই ভবিষ্যৎ বাণী মোটেও তাৎক্ষণিক আবেগের ফলশ্রুতি ছিল না। তিনি যে কথা বলেছেন তা বাস্তবসম্মত এবং সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সরকারের সঠিক এবং সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণের কারণে দেশের অর্থনীতিতে যে বিপর্যয়ের শঙ্কা করা হচ্ছিল, তা অনেকটাই কাটিয়ে উঠা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান সরকারের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে জীবন এবং জীবিকা দুটোকেই বাঁচাতে হবে। গত মৌসুমে করোনা এবং দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে বন্যার প্রাদুর্ভাব হওয়া সত্ত্বেও ধানের বাম্পার উৎপাদন হয়েছে। যথাসময়ে মাঠের ধান তোলার কাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে বন্যা সত্ত্বেও ফসলহানি হতে পারেনি। সরকার কৃষি খাতের জন্য যে আর্থিক প্রণোদনা দিয়েছে তা কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে চমৎকার অবদান রেখেছে। একইসঙ্গে পণ্য ও সেবা রপ্তানি খাতে

ইতিবাচক ধারা শুরু হয়েছে। করোনাকালে বিস্ময়করভাবে রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছে জনশক্তি রপ্তানি খাত।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হচ্ছে জনশক্তি রপ্তানি খাত। এখনো পণ্য রপ্তানি খাত থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। কিন্তু যে-কোনো বিবেচনায়ই জনশক্তি রপ্তানি খাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এবং গুরুত্বপূর্ণ খাত। জনশক্তি রপ্তানি খাতে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তার পুরোটাই জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। এছাড়া কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা নিরসনেও জনশক্তি রপ্তানি খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে প্রায় সোয়া কোটি বাংলাদেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে নানা সমস্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। ১৫ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৪২ বিলিয়ন (৪ হাজার ২০০ কোটি) মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আর কখনোই বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এতটা স্ফীত হয়নি। বাংলাদেশ বর্তমানে যে রিজার্ভ সংরক্ষণ করছে তা সার্ক দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের রেটিং অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়ে চলেছে তা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২৪ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হবে।

অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, একটি দেশের তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ থাকলেই তাকে সন্তোষজনক মনে করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ দিয়ে এক বছরের আমদানি ব্যয় মেটানো যেতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের এই স্বস্তিদায়ক অবস্থা সৃষ্টির পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান রেখেছে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স।

করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি জনশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দেশে ফিরে আসে। সেই অবস্থায় অর্থনীতিবিদদের অনেকেই শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, দেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতে বিপর্যয় আসন্ন। কিন্তু তাদের সেই শঙ্কা ইতোমধ্যেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি রপ্তানি মন্ত্রণালয়ের সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে জনশক্তি রপ্তানি খাতে কোনো বিপর্যয় তো হয়নি বরং রেমিটেন্স আহরণের ক্ষেত্রে একের পর এক রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে (জুলাই ২০২০) প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২৫৯ কোটি ৮২ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দেশে প্রেরণ করেন। এটা ছিল এ যাবৎকালের মধ্যে কোনো একক মাসে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স আহরণ।

নভেম্বর ২০২০ মাসের প্রথম ১২ দিনে রেমিটেন্স আহরণের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা মোট ১০৬ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার সমতুল্য ৯ হাজার ৬১ কোটি টাকা রেমিটেন্স দেশে প্রেরণ করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশের ইতিহাসে আর কখনোই কোনো মাসের ১২ দিনে এত বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স আহরিত হয়নি। এ নিয়ে চলতি অর্থবছরের (২০২০-২০২১) জুলাই থেকে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত সাড়ে ৪ মাসে মোট ১ হাজার ৪ কোটি ১৬ লাখ মার্কিন ডলার রেমিটেন্স আহরিত হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আহরিত এই রেমিটেন্সের পরিমাণ ৪২ শতাংশ বেশি। অর্থ মন্ত্রণালয় আশা করছে, আগামীতেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিটেন্স প্রেরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি এবং রেমিটেন্স আহরণের ক্ষেত্রে বিশ্বের ১০টি শীর্ষস্থানীয় দেশের অন্যতম। বাংলাদেশ বর্তমানে প্রতিবছর যে বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স আহরণ করছে তা আমাদের মোট জিডিপি'র প্রায় ১১ শতাংশের মতো। আগামীতে এই অবস্থান আরো সুসংহত হবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'করোনায়

অপ্রত্যাশিত অভিঘাতে সংকটে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতি। এমন এক সময় প্রবাসী রেমিটেন্স যোদ্ধারা কষ্ট করে রেমিটেন্স পাঠিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে সচল রেখেছেন'। তিনি আরো বলেন, '২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার সময় বলা হয়েছিল, বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণ করা হলে প্রেরিত রেমিটেন্সের ওপর ২ শতাংশ হারে নগদ আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হবে। তারপর থেকেই রেমিটেন্স বাড়তে শুরু করে।' তখন অনেকেই বলেছিলেন, এগুলো ঠিক নয়, টেকসই হবে না। অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, 'সংশয়বাদীদের বক্তব্য যে ভুল ছিল ইতোমধ্যেই তা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা সঠিক পথেই আছি'।

বর্তমান সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছেন জনশক্তি রপ্তানির নতুন নতুন গন্তব্য খুঁজে বের করার জন্য। বিশেষ করে ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপকভিত্তিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত স্বল্প খরচে যে কেউ এসব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে গমন করতে পারেন। বিদেশে প্রেরণের আগে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে স্থানীয় ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য দেশে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। আগামীতে যাতে সাধারণ শ্রমিকের পরিবর্তে পেশাজীবীদের অধিক হারে বিদেশে প্রেরণ করা যায় তার ব্যবস্থা করছে সরকার।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ স্ফীত করছে। জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখছে– এটা নিশ্চিতভাবেই আমাদের জন্য একটি সুসংবাদ। রেমিটেন্সের অর্থ আয়বর্ধক উৎপাদনশীল শিল্পকারখানা স্থাপনে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন দেশের বিনিয়োগ পরিবেশকে আরো উন্নত এবং আকর্ষণীয় করা। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) নানাভাবে বিনিয়োগ পরিবেশকে উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করেছে। ৫ই আগস্ট, ২০২০ অনুষ্ঠিত বিডার গভর্নিং বডির সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। আর বিনিয়োগ আহরণ করতে হলে বিনিয়োগ পরিবেশকে আরো উন্নত এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই মন্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ বর্তমানে বেশ উন্নত হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্সের ওপর ২ শতাংশ নগদ আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে যেমন রেমিটেন্স আহরণে এক ধরনের বিপ্লব সাধন করা হয়েছে, ঠিক একইভাবে সেই অর্থ স্থানীয় শিল্পকারখানায় বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্স বিনিয়োগে নিয়ে আসা গেলে তা দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করবে, রেমিটেন্সের সঠিক এবং উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা এখন সময়ের দাবিও বটে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ও অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক

প্রতিবন্ধীদের জন্য জব পোর্টাল

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের উদ্যোগে একটি জব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। সময়, অর্থ ও হয়রানি কমাতে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্মিত এই পোর্টাল অচিরেই উন্মুক্ত করা হবে বলে জানান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। ২১শে নভেম্বর আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে 'যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০২০'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই জব পোর্টালের মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা যে-কোনো স্থান থেকে চাকরির জন্য আবেদন ও ইন্টারভিউ দিতে এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রযুক্তিতে দক্ষ ও স্বাবলম্বী করতে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে 'আইসিটি ট্রেনিং ফর ইয়ুথ ডিজ্যাবিলিটি ইনক্লুডিং এনডিটি' শীর্ষক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সেই প্রকল্পের আওতায় বিশেষভাবে সক্ষম ২৫০০ জনকে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য আইসিটি বিভাগ প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন ডিজিটাল টুলস ও প্রশিক্ষণ মেট্রিয়াল তৈরি করছে।

প্রতিবেদন: তন্বী ভৌমিক

মুজিববর্ষের আলোকে বিজয় দিবসের তাৎপর্য

মিলন সব্যসাচী

২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়েছে। শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ই জানুয়ারি থেকে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হয়। সময়ের ব্যবধানে এরই মাঝে সমাগত ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস। মুজিববর্ষে এই বিজয় দিবসটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু। জন্মগত দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যেন দুটি ভিন্ন দেহে অভিন্ন একপ্রাণ। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু লিখতে বসলেই দৃষ্টির সীমানা ছুঁয়ে এসে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অনুষঙ্গে কিছু লিখলেই অমলিন ইতিহাস বঙ্গবন্ধু অনায়াসে জড়িয়ে যায়। অতএব, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এই ডিসেম্বর মাসেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও বিজয়– এক ও অভিন্ন সূত্রেগাথা এবং সার্থক সমার্থক। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক আহ্বানে মুক্তিকামী মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের জন্মদাতা।

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টির জন্যই (তৎকালীন বৃহত্তর ফরিদপুর) বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ কথাটি দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ নামে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হতো না। পাহাড় সমান বঞ্চিতব্যথা বুকে ধরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে-প্রতিশোধে বঙ্গবন্ধুই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। মুক্তির মশাল জ্বেলে সভা-সমাবেশে, মিছিল মিটিংয়ের অগ্রভাগে তিনিই অকুতোভয় সৈনিকের মতো সক্রিয় থাকতেন। তাঁর অসীম আকাশের মতো প্রশস্ত বুকজুড়ে ছিল সীমাহীন সাহস। পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে রেখে শাসকগোষ্ঠী তাঁর জন্য ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল। এমনকি কবর খুঁড়ে রেখেছিল। নিখাদ স্বদেশ প্রেমে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনড়, অটুট। অসাধারণ ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বাঙালি জাতিকে সুদীর্ঘ ২২ বছর ধরে প্রস্তুত করেছেন মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য। বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ মেধা, মনন, সাহসিকতা ও বীরত্বগাথার জন্যই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কেউ কি ভেবেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদিন বাঙালি জাতির পিতা হবেন? হাজার বছরের পরাধীন বাঙালি জাতিকে বঙ্গবন্ধু শৃঙ্খলমুক্ত করেছেন। এদেশের স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল ইতিহাসে শেখ মুজিব অমর-অক্ষয়। কুচক্রীরা যতই ইতিহাস বিকৃতি করার ঘৃণ্য প্রয়াসে মগ্ন থাকুক না কেন, বাঙালির হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার সাধ্য আছে কার? তাই অন্নদাশঙ্কর রায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কবিতার ভাষায় বলতে বড়ো সাধ হয়– 'যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা/ গৌরী যমুনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার/ শেখ মুজিবুর রহমান/ দিকে দিকে আজ অশ্রুমালা/ রক্তগঙ্গা বহমান/ তবু নাই ভয় হবে হবে জয়/ জয় মুজিবুর রহমান।' প্রকৃত অর্থেই

ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ (ছবিতে বাম দিক থেকে প্রথম ব্যক্তি শেখ জামাল)

মুজিবের জয় হয়েছে। কবিতার মতো কবির কল্পনার মতো শাশ্বত, সত্য, সুন্দর। এ জয়ের ব্যাপকতা যেন বাংলাদেশজুড়ে, এমনকি বিশ্বব্যাপী। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতি এখন বিশ্বের বিস্ময়। শত বছর পরেও বাঙালি ও বিশ্ববাসী বঙ্গবন্ধুকে পরম শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ এবং বরণ করছেন। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু বাঙালি তথা বিশ্ববাসীর কাছে আরো প্রভূতভাবে উদ্ভাসিত হয়েছেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাঁর ২৩ বছর রাজনৈতিক জীবনে প্রায় ১৩ বছর কারাবরণ করতে হয়েছে। কারাগারে বন্দি থেকেও তিনি আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে তিনি গ্রেপ্তার হন অতঃপর কারাগারের ভেতর থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁর মনের মাঝে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন, চিন্তা-চেতনা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আলোকিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর এই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা– এসব শব্দ উচ্চারণের প্রতি তৎকালীন সরকারের অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা ছিল। বিশ্বমানবতার জননী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম মুখে উচ্চারণ ও মনে ধারণ করার সুযোগ করে দিয়েছে। তাই এ জাতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। শেখ হাসিনার সাহসী রাষ্ট্রপরিচালনা আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী শেখ হাসিনা। তাঁর শ্রেষ্ঠতম পরিচয় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যকন্যা। কিউবার রাষ্ট্রপতি বিশ্বনন্দিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছিলেন–'আমি হিমালয় দেখিনি, বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি।' অর্থাৎ সর্বোচ্চ হিমালয়ের উচ্চ শেখরের সঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধুর তুলনা করেছেন। বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল। তাঁর দু'চোখের কোটরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া পর্যন্ত এমন কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চল নেই যেখানে বঙ্গবন্ধুর পদস্পর্শ পড়েনি। আটষট্টি হাজার গ্রামবাংলার মাটি ও মানুষের হৃদয়ের প্রাণপ্রিয় মানুষ বঙ্গবন্ধু। যাঁর মতো সংগ্রামী, ত্যাগী, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতা সমগ্র বিশ্বেই বিরল। বিশ্বের বহু নেতার মানবিক গুণাবলি, সাহসী বৈশিষ্ট্যকে ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধুতে পরিণত হয়েছেন তিনি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দরবারে উন্নত শিরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে শেখ হাসিনার নিরলস সাধনা ও দূরদর্শিতার কারণে। ২০৪১ সালের মধ্যে এদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। মুজিববর্ষের এই বিজয় দিবসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে খুব মনে পড়ে। ১৫ই আগস্ট রাতে কী নির্মমভাবে তাঁর শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের ঘাতকচক্র হত্যা করে। দীর্ঘদিন পরে হলেও খুনিচক্রের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। ২০২০ সালের স্বাধীনতা দিবস পালন করল সারা বাংলাদেশ। মাত্র এক বছর পরেই ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হবে। অনেক কণ্টকিত পথ পেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শক্তিশালী হাত ধরে বাংলাদেশ প্রতিক্ষণে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা এ বছর ৫০তম বিজয় দিবস পালন করছি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা একদিন 'সোনার বাংলা' নির্মাণে সক্ষম হবো। তারজন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম, সৎ ও সুন্দর নীতিমালা প্রণয়ন। বাঙালি জাতি ঐতিহ্যবাহী মহান জাতি। অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি কাঙ্ক্ষিত বিজয়, কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ। বাঙালি জাতি এখন বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। গোখলে বলেছিলেন– 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow' বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পাঠে জানা যায়। বঙ্গবন্ধু নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নেতাজীর বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতার কথা কে না জানে। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুর মধ্যে নেতৃত্ব ও সাহসিকতা জন্মাতে শুরু করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা শেখ লুৎফর রহমান বঙ্গবন্ধুকে উপদেশ দিয়েছিলেন- 'যে-কোনো কাজে Sincerity of purpose and honesty of purpose মেনে চলবে।' বঙ্গবন্ধু আজীবন এই উপদেশ মেনে চলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও সেই উপদেশ মেনে কাজ করে যাচ্ছেন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ শতকরা ৮০ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। কিন্তু এখন ঠিক তার বিপরীত প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে ২১.৮ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ। বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় উন্নয়ন এখন বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত ও নন্দিত। ২০২০-২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে যাচ্ছে। ২০৩০ সালে SDG'র গোলসমূহ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের একটি উন্নত রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কালজয়ী কীর্তির মাঝে ও স্বপ্নীল প্রত্যাশায় বঙ্গবন্ধু সতত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন। শেখ হাসিনার সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই পদ্মা সেতু এখন বাস্তবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। জয় হোক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার। জয় বাংলা।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও বঙ্গবন্ধু গবেষক

পাবনায় প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ

আমিরুল ইসলাম রাঙা

১৯৭১ সালের ২৮-২৯শে মার্চ পাবনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী যুদ্ধে পাবনায় দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সকলকে হত্যা করে হানাদার মুক্ত করা হয়। তারপর থেকে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত পাবনা মুক্তাঞ্চল ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটি ছিল এক বিরল ঘটনা। সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন পাবনার সর্বস্তরের জনগণ।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল গোটা দেশ। ১লা মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন, ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন, ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার ইশতাহার পাঠ, ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। সব মিলিয়ে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত একদিকে স্বাধিকার আন্দোলন, অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পাকজান্তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনা, অন্যদিকে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর থেকেই ছাত্র, তরুণ, যুবকদের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ চলতে থাকে।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর পাবনায় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আমজাদ হোসেন (এমএনএ)-কে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন– আব্দুর রব বগা মিয়া (এমপিএ), অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন (এমপিএ), দেওয়ান মাহবুবুল হক ফেরু (আওয়ামী লীগ নেতা), গোলাম আলী কাদেরী (আওয়ামী লীগ নেতা), আমিনুল ইসলাম বাদশা (ন্যাপ নেতা) ও আব্দুস সাত্তার লালু (জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি)। ২৫শে মার্চের পর তৎকালীন জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের খান এবং পুলিশ সুপার আবদুল গাফফার খানকেও কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৭ই মার্চের পর থেকে গোটা দেশে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। হরতাল, অবরোধ এবং মিটিং-মিছিলের সাথে পাবনা জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে পাড়া-মহল্লায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়। সেই সঙ্গে ছাত্রলীগের উদ্যোগে তরুণ যুবকদের সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । পাবনার মধ্যে শহরে গোপালপুর ক্লাবের উদ্যোগে জিলা স্কুল মাঠে তরুণ যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন, সৈনিক জাহাঙ্গীর আলম সেলিম (শানির দিয়াড় যুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা) এবং জিলা স্কুলের স্কাউট শিক্ষক মওলানা কসিম উদ্দিন (পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে নিহত শহিদ)। কাচারীপাড়া সাহারা ক্লাবের উদ্যোগে জিসিআই স্কুল মাঠে পৃথকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। সেখানে প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন, আনসার কমান্ডার আনোয়ার হোসেন ঘুটু। নয়নামতি অভিযান ক্লাবের উদ্যোগে চাঁদমারী মাঠে প্রশিক্ষণের প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন আনসার কমান্ডার ফুটু এবং রাধানগর মক্তবপাড়ায় অধিনায়ক ক্লাবের উদ্যোগে মক্তব পুকুরপাড়ে প্রশিক্ষণের প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন আনসার কমান্ডার খলিলুর রহমান। এই কার্যক্রম ১২ই মার্চ শুরু হয় এবং ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যুবকদের বাঁশের লাঠি ও স্কাউটদের ব্যবহৃত ডামি রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হতো।

২৫শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী সারা দেশে একসাথে অবস্থান গ্রহণ করে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় অপারেশন সার্চলাইটের নামে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। পাবনায় ২৬শে মার্চ ভোর থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অবস্থান গ্রহণ করে। ২৬শে মার্চ সকাল থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা খোলা জিপে মাইক বেঁধে কারফিউ আইন জারির ঘোষণা দেয়। সমস্ত জনসাধারণকে ঘরের মধ্যে থাকতে বলা হয়। দোকানপাট, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। কোনো মানুষ রাস্তায় বের হলে গুলি করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার পর মুহূর্তে গোটা শহর যেন নীরব হয়ে যায় । তখন বাইরে কী হচ্ছে সেটা বুঝবার বা জানবার কোনো উপায় নাই। তখন সারা দেশের কী অবস্থা সেটা জানার একমাত্র মাধ্যম হলো রেডিও। সেটা থেকে ভারতের আকাশবাণী, বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকার পরিবেশিত সংবাদ ছাড়া প্রকৃত ঘটনা জানার উপায় ছিল না। কারফিউ চলাকালে পাবনা শহরে মাঝে মাঝে সেনাবাহিনীর গাড়ির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না।

২৬শে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা পাবনা শহর থেকে নবনির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (এমপিএ) অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। তিনি ছিলেন পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতা এবং ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া আসন থেকে নির্বাচিত এমপিএ। এছাড়া একইদিন ভাসানী ন্যাপের পাবনা জেলা সভাপতি ডা. অমলেন্দু দাক্ষী, রাধানগর তৃপ্তি নিলয় হোটেলের মালিক ও মটর ব্যবসায়ী সাঈদ তালুকদার, দিলালপুর মহল্লার আইনজীবী মোশাররফ হোসেন মুক্তার, ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক শফিকুল হায়দার, আইনজীবী মুছা মোক্তার, এডরুক ঔষধ কারখানার মালিক আবদুল হামিদ খান, সিগারেট কোম্পানির এজেন্ট হাবিবুর রহমান, পৌরসভার ট্যাক্স কালেক্টর খালেক তালুকদার, কাপড় ব্যবসায়ী সাহাজ উদ্দিন মুন্সিসহ প্রায় শতাধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করে বিসিক নগরীর সেনা ক্যাম্পে নেওয়া হয়।

২৫শে মার্চ রাতে রাধানগর এলাকায় মুসলিম লীগ নেতা খন্দকার নূরু চেয়ারম্যানের বাড়িতে কৃষ্ণপুর মহল্লার মটর শ্রমিক শুকুর

আলীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যার পর কৃষ্ণপুর মক্তব স্কুল প্রাঙ্গণে শুকুর আলীর জানাজা নামাজের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুসল্লিদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এ সময় শেখ আব্দুস সামাদ নামে এক মুসল্লি নিহত হন এবং মাওলানা ইব্রাহিম হোসেন ও শেখ বদিউজ্জামান নামে অপর দুই মুসল্লি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

এদিকে ২৬শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাবনায় আসার পর জেলা প্রশাসক নূরুল কাদের খান এবং পুলিশ সুপার আব্দুর গাফফার খানকে দেখা করতে বলেন। সেই সাথে পাবনা পুলিশ লাইনের সমস্ত পুলিশকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন। ডিসি এবং এসপিকে তলব করার পরও দেখা করেন না তাঁরা। তখন পাকিস্তনি সৈন্যরা তাঁদের বাসভবনে অভিযান চালায়। অভিযান চালানোর আগেই ডিসি ও এসপি তাঁদের বাসভবন ত্যাগ করে পাবনার দক্ষিণ দিকে চরাঞ্চলে আশ্রয় নেন। ঐ অঞ্চলের প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা নবাব আলী মোল্লার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে পাবনার প্রধান প্রধান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য যোগাযোগ করেন। এ উদ্যোগে সাড়া দিয়ে আমজাদ হোসেন, আব্দুর রব বগা মিয়া, ওয়াজি উদ্দিন খান, গোলাম আলী কাদেরী, রফিকুল ইসলাম বকুল, ফজলুল হক মন্টু প্রমুখ নেতারা বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, পাবনায় অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করার। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৭শে মার্চ সারাদিন শহরের চারপাশে তরুণ যুবকদের সংগঠিত এবং লাইসেন্সকৃত দেশীয় বন্দুক সংগ্রহ করার অভিযান চালানো হয়। সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় তরুণ-যুবকরা, লাঠি-ফালা, তীর-ধনুক এবং দেশীয় অস্ত্র সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হতে থাকে।

২৭শে মার্চ গভীর রাতে পাবনার জেলা প্রশাসক নূরুল কাদের খান, পুলিশ সুপার আব্দুল গাফফার খান, আওয়ামী নেতা নবাব আলী মোল্লা, ছাত্রনেতা রফিকুল ইসলাম বকুল এবং ফজলুল হক মন্টুর নেতৃত্বে শতাধিক যোদ্ধা চরাঞ্চল থেকে পুলিশ লাইনের দক্ষিণ অংশে অবস্থান নেন। ভোর রাতের দিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা পুলিশ লাইনের পূর্ব ফটকের (বর্তমান পোস্ট অফিস) সামনে এসে হ্যান্ডমাইকে পুলিশ সদস্যদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাতে থাকে। এমন একটি সময়ে ডিসি অফিসের ছাদে, জজকোর্টের দক্ষিণ পাশে এবং জিসিআই স্কুল অঞ্চল থেকে একযোগে মুক্তিযোদ্ধারা গুলিবর্ষণ শুরু করে। চারপাশে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিবর্ষণ এবং পুলিশ লাইন থেকে পুলিশের গুলিবর্ষণে পাকিস্তানি সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা একদল পালিয়ে বিসিক নগরীতে যায় এবং আরেক দল টেলিফোন এক্সচেঞ্জে আটকা পড়ে। এরপর মুক্তিকামী জনতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের চারদিকে ঘিরে পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর গুলি চালাতে থাকে। এই সময়ে পাবনার ডিসি এবং এসপি'র নির্দেশে পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগার খুলে দেওয়া হয় । তখন পুলিশসহ ছাত্র-জনতা পাকসৈন্যদের ওপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু করে। সারারাত ধরে গোলাগুলি চলার পর ভোর থেকে তুমুল আক্রমণ শুরু হয় । দুপুরের আগেই টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অবস্থানরত ২৮ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করা হয়। ২৮শে মার্চ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখল করার পর একইদিন দুপুরে লস্করপুর (বর্তমান বাস টার্মিনাল) আর্মি চেকপোস্টে আক্রমণ করা হয়। লস্করপুর যুদ্ধে তিনজন এবং বালিয়াহালট গোরস্থান যুদ্ধে দুজন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করা হয়। লস্করপুর যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথম শহিদ হন শামসুল আলম বুলবুল (যার নামে সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজ), আমিরুল ইসলাম ফুনু, মুকুল ও আফসার উদ্দিন।

২৯শে মার্চ সকালের দিকে মুক্তিকামী জনতা বিসিক শিল্প নগরীতে অবস্থিত পাকিস্তান বাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করে। এদিকে বিসিকে আটকে পড়া সেনাদের উদ্ধারে রাজশাহী সেনানিবাস থেকে বেশ কয়েকটি ট্রাক নিয়ে পাবনা অভিমুখে রওনা হয়। আকাশে জঙ্গি বিমানের ছত্রছায়ায় ট্রাকগুলো পাবনা বিসিকে প্রবেশ করে আটকে পড়া সৈন্যদের নিয়ে মানসিক হাসপাতালের পাশ দিয়ে পাকশীর অভিমুখে রওনা হয়। পথিমধ্যে দাপুনিয়া, মাধপুর, দাশুড়িয়া হয়ে লালপুর পৌঁছানোর আগে ১৭টি স্থানে যুদ্ধ হয়। এসব যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের অনেকেই নিহত হয়। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, পাবনার প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে মেজর আসলামসহ প্রায় ২ শতাধিক পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়েছিল। এদিকে পলায়নরত পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে মালিগাছা যুদ্ধে আটঘরিয়া থানার দারোগা আব্দুল জলিল শহিদ হন। মাধপুর, দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, লালপুর পর্যন্ত প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রায় ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। বিসিক মুক্ত হবার পর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আটক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন, ন্যাপ নেতা ডা. অমলেন্দু দাক্ষী, সাঈদ তালুকদার, রাজন পাগলসহ অজ্ঞাত অনেকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়।

২৯শে মার্চ পাবনা প্রথম জেলা হিসেবে হানাদার মুক্ত হয়। ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত পাবনা মুক্ত থাকে। প্রায় ১২ দিন পাবনার ঘরে ঘরে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা উড়েছে। ২৯শে মার্চ থেকে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত পাবনা জেলা প্রশাসক নূরুল কাদের খানের নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নামে প্রশাসন পরিচালিত হয়েছিল। এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে যাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল, তাঁরা হলেন পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আমজাদ হোসেন এমএনএ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব বগা মিয়া এমপিএ, ন্যাপনেতা আমিনুল ইসলাম বাদশা, রনেশ মৈত্র, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম আলী কাদেরী, দেওয়ান মাহবুবুল হক ওরফে ফেরু, ওয়াজি উদ্দিন খান, নবাব আলী মোল্লা, পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সাত্তার লালু, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বকুলসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের। পাবনার প্রতিরোধ যুদ্ধের সেই গৌরবময় ইতিহাসের কথা লিখতে গেলে আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বলতে হয়। তাঁরা হলেন পাবনার তৎকালীন জেলা প্রশাসক নূরুল কাদের খান, যিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রথম জেলা প্রশাসক এবং তৎকালীন পুলিশ সুপার আব্দুল গাফফার খান।

এছাড়া প্রতিরোধ যুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) রবিউল ইসলাম রবি ও শিরিন বানু মিতিলসহ তাঁদের নেতাকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে ছাত্রলীগের রফিকুল ইসলাম বকুল, ইকবাল হোসেন, সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, বেবী ইসলাম, মো. ইসমত, ফজলুল হক মন্টু, মোখলেছুর রহমান মুকুল, সাঈদ আকতার ডিডু প্রমুখ ছাত্রনেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁদের সেই সাহসী ভূমিকার কথা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে পাবনার প্রতিরোধ যুদ্ধটি ছিল প্রথম জনযুদ্ধ এবং প্রথম হানাদার মুক্ত জেলা। অপরদিকে এই যুদ্ধে দেশের প্রথম সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন শহিদ হন। মুক্তিযুদ্ধে পাবনার প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের ঘটনা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক

দেখার ভুবন

সেলিনা হোসেন

মোবাইল ফোন অন করলে যে ছবিটি ফুটে ওঠে সেটি ভাস্করের কাছে কোনো সাধারণ ছবি নয়। ছবিটির নানা ব্যাখ্যা করে ও আনন্দ পায়। ভাবে, এটাও বেঁচে থাকার উপাদান। একে বেঁচে থাকার শর্তও বলা যায়। বেঁচে থাকা তো শুধু শ্বাস ফেলা নয়। দম বন্ধ করে পূর্ণতার অনুভবই বেঁচে থাকার অনেক শর্তের একটি।

ছবিটিকে ভাস্কর কখনই সাধারণ ছবি মনে করে না। বন্ধুদের দেখিয়ে বলে, এর অনেক ব্যাখ্যা আছে।

বোগাস! চেঁচিয়ে ওঠে নিলয়।

আমাদের বেশি কিছু বোঝাতে হবে না। চেঁচিয়ে বলে সুতপা।

জ্ঞান জাহির করার জায়গা পাশ না। এটা তোর খুব খারাপ অভ্যাস ভাস্কর।

ও না হয় নিজের ভালো লাগার কথা বলেছে। তোরা ওর সঙ্গে এমন করছিস কেন? ছবিটা নিয়ে ওর আনন্দ আছে, বিষণ্নতা আছে। থাকতে দে। আমরা কেন ওকে খোঁচা দেব?

বুঝেছি তুই ওর সবচেয়ে ভালো বন্ধু। আমরা ওর ফালতু বন্ধু।

হা-হা-হা-হো হাসিতে মেতে ওঠে সবাই। ভাস্করও প্রাণখোলা হাসিতে দিগন্ত মাতায়।

ছবিটি ও তুলেছে তিস্তা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে শ্রাবণের এক রোদঝরা দিনে। নদীর তরঙ্গ স্রোতে নীলাভ আভা ছিল। নদীর উপরে ছিল নীল আকাশের উজ্জ্বল দীপ্তি। পঞ্জীভূত সাদা মেঘের গা-ভাসিয়ে রাখা সৌন্দর্যে যৌবনের স্ফূরণ ছিল। ঝকঝক করছিল দিগন্ত রেখা। ওর মনে হয়েছিল এক আশ্চর্য প্রদীপ্ত যৌবন এখানে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বুকভরা আবেগে ও দিশেহারা হয়ে উঠেছিল। পুরো প্রকৃতিতে যৌবনের স্রোত এক অবিস্মরণীয় সময়ের কথা বলেছিল ওকে। ও বুঝেছিল নদীর স্রোত এবং পেঁজোতুলোর মতো টুকরো মেঘের ভেসে থাকার গতিতে যৌবন আছে। একই কথাই ও বন্ধুদের বলে। বলে, যৌবন হলো বেঁচে থাকার সবচেয়ে সুন্দর সময়। জানিস, এই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলে আমার ডিপ্রেশন কেটে যায়। আমার ভেতরে নিঃসঙ্গতা থাকে না। মনে হয় আমি এক গভীর বিনোদনে আছি।

বেশ বলেছিস বন্ধু। তোর সামনে এখন কবি হওয়ার সময়।

রাকিব ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে তালি দিলে অন্যরাও তালি বাজায়। এভাবেই ভাস্কর প্রচলিত আড্ডা ভেঙে দেয়। নদীর কথা বলতে শুরু করে।

তিস্তা আমার প্রাণের নদী। এই নদীর পাড়ে বড়ো হয়েছি। পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে যেতাম।

হয়েছে বুঝেছি, তোর অনেক স্মৃতি আছে। বাড়ি দিয়ে কথা বলে সুতপা। এখন তোর জ্ঞানের কথা বল।

হ্যাঁ, তিস্তার খোঁজখবর তুই রাখিস। বল শুনি। নিলয় নড়েচড়ে বসে আবার বলে, একদিন বলেছিলি তিস্তা নদী সিকিম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে।

যখন ঢুকেছিল তখন বাংলাদেশের জন্ম হয়নি।

জানি, জানি। এসব হাজার বছর আগের কথা। তুই বাংলাদেশ ধরেই বল।

রাকিব ওকে উচ্ছ্বসিত রাখতে চায়। ও নানা কারণে ডিপ্রেশনে ভোগে। কেন এর কোনো উত্তর নেই ভাস্করের কাছে। রাকিব মাঝেমধ্যে বলে, তোর সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে যাওয়া উচিত। ডেট ঠিক কর, আমি তোর সঙ্গে যাব।

না, ভাস্কর গভীর চোখে তাকিয়ে না বলে। গাঢ় স্বরে বলে, এটা আমার কাছে কোনো অসুখ নয়। আমি ডিপ্রেশন এনজয় করি।

বোগাস! রাকিব ঝাড়ি দেয়। বাহাদুরি নেওয়ার চেষ্টা করিস না। একদিন বুঝবি ডিপ্রেশন তোকে কোথায় নিয়ে ফেলবে।

ভাস্কর নিশ্চুপ থাকে। নিজের ডিপ্রেশন নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে না।

কী রে কথা বলছিস না কেন?

ভাস্কর সবার মুখের উপর নিজের দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলে সুতপা চেঁচিয়ে বলে, তোর দৃষ্টি নদীর মতো লাগছে রে ভাস্কর। তোর চোখ এখন চোখ না, তিস্তা নদী।

হা হা করে হাসে সবাই।

নিলয় হাসতে হাসতে বলে, সুতপাও কবি হবে।

তখন ভাস্কর কারো দিকে না তাকিয়ে বলতে থাকে, পাহাড় থেকে নেমে খরস্রোতা তিস্তা নদী নীলফামারি, লালমণিরহাট, কুড়িগ্রামের চিলমারী হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে মেশার জন্য ছুটল।

অন্যরা হাততালি দিতে দিতে বলে, দুয়ের মিলন মহামিলন– হা হা হা। মিলেমিশে সাগরে গেল।

বোগাস! চুপ কর।

তুই আর কিছু বলবি?

না। আমি বেশি কথা বলি না।

তোর নদী তো এখন বালুচর। তিস্তার ধারের মানুষ–

চুপ কর। আমার নদী, নদীই।

তোর ওই ছবির মতন।

হ্যাঁ, তাই। আর কিছু শুনতে ভালো লাগে না।

হয়েছে কী তোর?

কী আবার, আমি বুঝেছি ও এখন ডিপ্রেশনে ঢুকেছে।

ডিপ্রেশনের সঙ্গে প্রেম এবং বসবাস।

না, তোদের সঙ্গে আমার হবে না। গেলাম।

রাকিব হাত টেনে ধরে বলে, কাউনিয়া কবে যাবি?

আগামী শুক্রবারে।

আমিও যাব তোর সঙ্গে। দেখে আসব তোর ক্যামেরার সুন্দর দৃশ্য।

নিলয় লাফিয়ে ওঠে, আমিও যাব।

সুতপা জিজ্ঞেস করে, তোর সেই মাছধরা ছেলেগুলো কেমন আছে রে?

ওদের আবার থাকা। বেঁচে আছে এই বেশি।

তা ঠিক। বাপ-মায়ের দিনমজুরির টাকায় কি দিন চলে? নাকি সব বেলায় ভাত জোটে।

হয়েছে এসব নিয়ে আর গবেষণা করতে হবে না। আয় আমরা ওদের বেঁচে থাকা সেলিব্রেট করি।

কীভাবে? তোর যত পাগলামি সুতপা?

আমি নদীর কবিতার দুটো লাইন মুখস্ত বলে সেলিব্রেট করতে চাই।

কার কবিতা?

সৈয়দ শামসুল হকের।

দারুণ। বল দেখি।

পুরো কবিতাটা মুখস্ত নেই। ভালো লাগার কয়েকটি লাইন শোনাচ্ছি তোদের। সুতপা গলা কেশে নিয়ে এক মিনিট চুপ করে থেকে বলতে শুরু করে, 'বাঙাল নদীর দেশে একদিন দুপুর বেলায় ...।' ও এক মুহূর্ত থেমে আবার বলে, 'আজও আমি দেখে উঠি নদীও রূপের মোহে ঘূর্ণিজলে গান করে ওঠে রোদের হাঁসুলি পরে ঢেউগুলো ভাঙে আর গড়ে....।' ও আবার থামে। সবার মুখের দিকে তাকায়। অন্যরা চুপ করে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকে। ও বলতে শুরু করে, 'এ নদী এখনও আছে– আছে তার সেই নাব্যতাও। অঙ্গের হলুদ নিয়ে আজও সেই নদীঢেউ বাংলার গভীরে/বাঙালি বরের মন ভাঙছে কোথাও।'

সুতপা শেষ করলে বাকিরা হাততালি দেয়।

দারুণ বলেছিস রে।

এই না হলে সুতপা। ও বেঁচে থাকাটা সেলিব্রেট করল দারুণভাবে।

ভাস্কর গদগদ স্বরে বলে, কংগ্রাচুলেশনস সুতপা। আমি মাছধরা ছেলেদের কাছে গিয়ে তোর কথা বলব।

মাছধরা ছেলেদের কাছে আমিও যেতে চাই।

চল, আমরা একসঙ্গে একটা প্রোগ্রাম বানাব।

হ্যাঁ, তাই করব। ওদের আমার দেখতেই হবে।

ভাস্কর তুই ওদের ছবি তুলিসনি?

তুলেছিলাম। এখন নেই আমার কাছে।

ছবি দেখব না। ওদের দেখব।

ঠিক বলেছিস। আসল দৃশ্য দেখাই দরকার।

ভাস্কর মনে মনে বলে, দৃশ্য। হ্যাঁ, দৃশ্যই। ওরা ঘাসের দড়িতে মাছ ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরছে– এমন দৃশ্য তো ও কতবারই দেখেছে। কিন্তু এই দৃশ্যের ব্যাখ্যায় যৌবন নেই। এই দৃশ্য মরা শৈশবের দৃশ্য। এতে ছবির ব্যাখ্যা হয় না। ও ডিপ্রেশনের ভেতরে ঢুকতে থাকে।

আড্ডা ভেঙে গেলে যে যার পথে যায়। ভাস্করের মনে হয় ওর পথ নেই। ও এই মুহূর্তে পথহারা বালক। ফুটপাথটা বালুর চর। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ও ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। মাথা ঝিমঝিম করে। রাস্তার ধারে চা খাওয়ার জন্য দাঁড়ায়। কাছে গিয়ে বেঞ্চের উপরে বসে। দোকানি জিজ্ঞেস করে, সাদা চা না লাল চা দিমু স্যার?

ভাস্কর দূরের দিকে তাকিয়ে বলে, লাল। দোকানির মুখ দেখার ইচ্ছা হয় না ওর। ওর ডিপ্রেশন বাড়তে থাকে।

পাশে বসে থাকা ছেলেটা হাততালি দিয়ে বলে, লাল, লাল। লাল চায়ে লাল পিঁপড়া। সাদা চায়ে কালো পিঁপড়া।

তুই কি আমাকে পিঁপড়া খাওয়াবি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। হাসিতে গড়িয়ে পড়ে ছেলেটি।

দোকানি বলে, ও আমার ছেলে নয়ন স্যার। সবার লগে এমুন মজা করে।

কোন ক্লাসে পড়ে?

থিরি পর্যন্ত পড়াইছি। অহন আর পড়ে না। ওর মা বাসাবাড়িতে কাজ করে। আমি চা বেচি। অরে ইশকুলে নিমু কহন?

তাইতো। ভাস্কর উদাস হয়ে যায়। মাছধরা ছেলে দুটির চেহারা মনে হয়। ওদেরও স্কুল নাই। দোকানি চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়। লোকটার চোখে চোখ পড়ে ভাস্করের। মনে হয় লোকটার বাড়ি বুঝি তিস্তা পাড়ের কোথাও। ও চোখ নামিয়ে চায়ে চুমুক দেয়। মাথা ঘুরিয়ে নয়নকে বলে, তোর বাবা আমাকে পিঁপড়ে দেয়নি রে ছোটকু।

আমি ছোটকু না, আমি নয়ন।

তুই আমার আদরের ছোটকু।

আমি আদর চাই না।

তাহলে কী চাস? পিঁপড়ে ভাজা?

হি হি করে হাসতে হাসতে বেঞ্চ থেকে নেমে দৌড়ে যায় ফুটপাথের খানিকটুকু। ভাস্করের কানে ওর হাসির শব্দ লেগে থাকে। এই সময়টুকু উপভোগ করবে বলে ও কারো দিকে তাকায় না। দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আশপাশের গাছে দোয়েল কিংবা বুলবুলি আছে। ডাক ভেসে আসছে। ও কান পেতে শোনে। পাখির ডাকের সঙ্গে নয়নের হাসির কোনো তফাত খুঁজে পায় না। দুটোই এক হয়ে ওকে নিয়ে যায় কাউনিয়ায়। দৌড়ে আসে দুই ভাই।

– সংবাদ কাকু তুমহি ক্যানকা আছ? হামারকে কুথা মনে আছে তুমহার?

ওদের একজন নয় বছরের রতন। অন্যজন দশ বছরের মানিক। ওরা মাছ ধরতে ভালোবাসে। ওদের বাবা-মা দিনমজুরির কাজ করে। এলাকায় তিস্তা নদীর বালুচর নিয়ে রিপোর্ট করতে এলে হাসিখুশিতে ভরা ছেলে দুটোকে নিয়ে মজা করেছিল ও। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কোন ক্লাসে পড়িস তোরা?

ওরা হাসতে হাসতে বলে, মাছধরার ক্লাসে।

গাধা। বাদরামি করার জায়গা পাশ না? স্কুলের নাম কী?

তিস্তা নদী। হাসতে হাসতে দুই ভাই লাফালাফি করে। ঘাসের দড়িতে বেঁধে কাঁধে মাছ ঝুলিয়ে বাড়িতে ফেরে ওরা। ওদের কাছে নদীই স্কুল। ওদের কাছ থেকে এমন কথা শুনে ভালো লেগেছিল ভাস্করের। ওদের ঘাড়ে হাত রেখে বলেছিল, নদীর পাড়ে এইখানে দাঁড়া। তোদের ছবি তুলব।

না, না আমরা ছবি তুলবহ না।

দুজনে ছুটে চলে গিয়েছিল। নদীর পাড় ধরে অনেকটা পথ দৌড়ে ঘরের আড়ালে চলে গেলে ভাস্করের মনে হয়েছিল ওরা ছবির চেয়ে বেশি সুন্দর। ওদের ছবি তোলার দরকার নেই। নিজস্ব ভাবনার মাঝে কাপের বাকি চা শেষ করে। কাপ-পিরিচ দোকানির হাতে দেওয়ার সময় দোকানি জিজ্ঞেস করে, আপনে অ্যাতক্ষণ কার কথা মনে করলেন?

তোমার ছেলের মতো দুটো ছেলের কথা।

আমার পোলাডা খুব দুষ্টু। কারো কথা হোনে না।

এই শহরের সব জায়গাই ওর জন্য স্কুল ভাই। ও নিজের মতো করে শিখে বড়ো হচ্ছে।

বকতিতা দিলেন স্যার। আমার পোলার কামে লাগবে না।

লাগবে। তুমি এখন বুঝতে পারছ না।

ভাস্কর পকেট থেকে টাকা বের করে চায়ের দাম দেয়। তখন নয়ন দৌড়ে এসে কাছে দাঁড়ায়।

কী রে কোথায় গিয়েছিলি?

জানি না।

ও প্যান্টে হাত ঘঁষে।

জানবি না কেন? পাখি দেখতে গিয়েছিলি?

না। শঅরের পাখি তো পাখি না।

তবে কী? ভাস্কর কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে তাকায়।

মেশিন।

মেশিন? কী বলিস?

হ, হ। ঠিকই কই। হাসতে হাসতে লাফায় ও।

পাখি ডাকে না। মেশিনের মতো শব্দ করে, না রে? ও ঘন ঘন মাথা ঝাঁকায়।

দোকানির দিকে তাকিয়ে ভাস্কর চোখ বড়ো করে বলে, দেখ তোমার ছেলের পড়ালেখা। ও চারপাশ থেকে দেখে শিখছে।

দোকানি উত্তর দেওয়ার আগেই দুজন লোক আসে দোকানে। বেঞ্চের উপর বসে বলে, দুধ চা দাও।

তারপর নিজেরা কথা বলতে শুরু করলে ভাস্কর ফুটপাথ ধরে এগোতে থাকে। পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পায় ছেলেটি নারকেল গাছের গোড়ায় বসে আঙুলে কোনো কিছুর হিসাব করছে। এক-দুই করে করে গুণছে। ভাস্করের ভেতরে ডিপ্রেশন ঘূর্ণির মতো পাক খায়। ওর মাথা টলে ওঠে। রাস্তার ধারের একটি গাছে পিঠ ঠেকিয়ে মোবাইল অন করে। ভেসে ওঠে অপরূপ সৌন্দর্যের ছবিটি। ওর চোখের ভেতরে জলের ধারা নামে। চোখ মোছে না। ঝাপসা চোখেও ছবিটি যৌবন হয়ে ওকে টেনে নিয়ে যায় তিস্তার ধারে। নদীতে লাল রঙের পাল উড়িয়ে চলে যাচ্ছে নৌকা। যেন রতন আর মানিক যৌবনে পৌঁছেছে। লাল রঙের পালের নৌকা উড়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে। ভাস্কর নিজের ভাবনায় মগ্ন হয়ে গাছের কাণ্ডে মাথা ঠেকিয়ে আকাশ দেখে। ওর মাথার ঝিমঝিম ভাব কাটতে থাকে। কিন্তু অবসন্ন বোধ করে। কীভাবে বাড়ি ফিরল বুঝতে পারল না। প্রবল বিষণ্নতায় ওর সামনে থেকে শহরের চেহারা মুছে গেল। শুনতে পাচ্ছে পাখিগুলো ওর চারপাশে মেশিনের মতো শব্দ করছে। ওর মাথার ভেতরে ঘর্ঘর শব্দের ঘূর্ণি।

এসবের মাঝে দিন গড়ায়। খবর সংগ্রহের জন্য যেতে হয় বিভিন্ন এলাকায়। ধুপ করে মনে হয় অনেক দিন কাউনিয়া যাওয়া হয়নি। কেমন আছে মাছধরা ছেলেরা সে খোঁজও ওর কাছে নেই। মন খারাপ হয়ে থাকে। এরমধ্যে শুরু হয় প্রবল বর্ষা। নদীগুলোর পানি বাড়ছে। চারদিকে বন্যার আশঙ্কা। একদিন পত্রিকা অফিস থেকে ওকে কাউনিয়ায় খবর সংগ্রহের জন্য যেতে বলা হলো। তিস্তার দুপাড়ের কোথাও কোথাও ভাঙন শুরু হয়েছে।

কাউনিয়া যাবার কথা শুনে বন্ধুরা বলল, তোর সঙ্গে আমরাও যাব।

কেন? এই বর্ষায়–

বর্ষার তিস্তা দেখার জন্যই তো যাব। ভরা যৌবনের নদী।

ঠিক। আমারও তাই মনে হয়। তোর ছবিতেই আমরা দৃষ্টি আটকে রাখব নাকি? বাস্তবে দেখতে হবে না?

সুতপা তুড়ি দিয়ে কথা বলে। ওর সঙ্গে কথা যোগ করে নিলয়।

তোর দেখা মাছধরা সব বিচ্ছুও দেখতে চাই।

ঠিক আছে চল। ভালোই হবে।

এমন মিনমিন করে বলছিস কেন?

সুতপা ওর দিকে তাকিয়ে বলে, ভাস্কর এখন ডিপ্রেশনে আছে। ওকে আর না ঘাঁটানোই ভালো।

ভাস্কর অন্যদিকে দৃষ্টি ঘোরায়। বোঝাতে চায় ওর আশপাশে কেউ নেই। দূরের আকাশের নীলাভ দৃশ্য ওর সামনে সৌন্দর্য তৈরি করে না। ও মোবাইলের সুইচ অফ করে দেয়।

দুদিন পরে ওরা যখন রতন আর মানিকের এলাকায় পৌঁছায় তখন কালো মেঘে ঢেকেছিল আকাশ। কিন্তু বৃষ্টি নেই। ওরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

ভালোই হয়েছে। বৃষ্টিতে না ভিজেই নদীর পাড়ে ঘোরা যাবে।

নিলয় ফোঁস করে ওঠে, মোটেই ভালো হয়নি। বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজব এটাই তো চাই।

সুতপা ঝাড়ি দেয়, আজ তোর ইচ্ছার পূরণ হবে না। চল নদীর ধারে যাই। আমি রতন-মানিকের হাত ধরে নদীর পাড়ে দৌড়াব। আর বলব, স্রোত তুমি আমাদের সঙ্গে থাক।

জোরে জোরে হাসে সবাই। হাসতে পারে না ভাস্কর। নদী আর কালো মেঘের পাহাড় ওকে বিষণ্ন করে রাখে। নদীর দিকে যেতে যেতে চমকে ওঠে ওরা। এত ভিড় কেন? কারো ঘর কি ভাঙনে তলিয়ে গেল? তখন কাঁদতে কাঁদতে দৌড়াতে থাকে দুটো মেয়ে। ভাস্কর ওদের পথ আটকায়।

কী হয়েছে রে ওখানে?

মানিক-রতন শ্যাষ। নদী গিলে খাইছু।

কী? কী বললি?

সুতপার আর্ত-চিৎকার বাতাসের বেগে ছুটে যায়। দৌড়ে ভিড়ের কাছে যায় ওরা। লোকজন ওদের নদী থেকে উঠিয়েছে। ঘাসের উপর রাখা হয়েছে ওদের প্রাণহীন দেহ। পাশ থেকে কেউ একজন বলছে, ওরা যেখানে বসে মাছ ধরছিল সেখানে পাড় ভেঙে ওদের মাথার উপর পড়ে। আহা রে, আহা রে, ছাওয়াল দুইডা– চারদিকে কান্নার ধ্বনি। বাবা-মাকে সামলানো যাচ্ছে না। ঘাসের উপর গড়াগড়ি করছে মা। ওদের কাছে বসে কাঁদছে সুতপাও।

ভাস্কর নিজের ভেতরে মগ্ন হয়। বাস্তব ওর সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। জেগে থাকে তরঙ্গসংকুল নদী। কালো মেঘে ঢেকে রাখা আকাশ এবং জলের পরশে স্নিগ্ধ চেহারার দুই বালক। এমন অপরূপ দৃশ্য ধারণ করার জন্য ও নিজের ভেতরে শক্তি সঞ্চয় করে।

ক্যামেরায় দৃশ্যটি ধারণ করার সময় ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে– কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই। কিন্তু বলা হয় না। বুকফাটা চিৎকারে ও হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে।

স্তব্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষ।

বেগম রোকেয়া: ইতিবাচক ভাবনার সারথি

প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম

বেগম রোকেয়ার কালে সমাজে নারীজীবনে ছিল মনোকষ্ট। জমিদার পরিবারের বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্যেও নারীদের সুখের তিয়াস মেটেনি। কারণ নারীর বন্দিত্ব– নারীশিক্ষার ও মনোবিকাশের সুযোগের দুয়ার ছিল রুদ্ধ। সমাজে নারীর মর্যাদাহীন অবস্থানের যাতনার প্রবল তরঙ্গ বয়ে বেড়িয়েছেন বেগম রোকেয়া। তবে অনেকের মতো তিনি নীরব থাকতে পারেননি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন অকপটে বলিষ্ঠ ভাষায়।

আশার বিষয় হলো– সমাজের বাধাসত্ত্বেও সম্মুখযাত্রায় ভেঙে পড়েননি বেগম রোকেয়া। লড়াই করে গেছেন নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, স্বাবলম্বনের পথের সন্ধান দিয়েছেন। নারী জাগরণের পথপ্রদর্শক তিনি। নারীকে আত্মসচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করে অধিকার আদায়ের মনোবৃত্তি সৃজনে রেখেছেন বলিষ্ঠ ভূমিকা। অবশ্য এজন্য নিজের জীবনও গড়েছেন শিক্ষার আলোয়। রংপুরের পায়রাবন্দে উর্দুভাষী জমিদার পরিবারে জন্মেও বাংলা ও ইরেজি আয়ত্ব করেছেন নিপুণ আন্তরিকতায়। পারিবারিক সংকীর্ণতা ডিঙিয়েছেন অদম্য সাহসে।

বেগম রোকেয়ার সাহসী চেতনার বহিঃপ্রকাশ তাঁর স্কুল প্রতিষ্ঠা, 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম', সামাজিক সংগঠন তৈরি, সাহিত্যের ভাষায় নারী জাগরণের প্রদীপ্ততায়। নারীর জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা খুব সহজ ছিল না তাঁর সময়ে। সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে তিনি গড়েছেন স্বপ্নের সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। ভাগলপুর থেকে কলকাতায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিচয় দিয়েছেন অদম্য মানসিকতার। আঞ্জুমানের খাওয়াতীনে ইসলাম সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে নারীর সামাজিক অধিকারের বিষয়গুলো বিস্তৃত করেছেন তিনি।

নারী ভাগ্যের উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজন কর্মসংস্থান। কর্মদক্ষতা অর্জনে শিক্ষা, বিশেষত বৃত্তিমূলক শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। *পদ্মরাগ* উপন্যাসে নারীদের স্বাবলম্বনের পথের ঠিকানা দিয়েছেন বেগম রোকেয়া। নায়িকা সিদ্দিকাকে স্বাবলম্বন প্রসঙ্গে বলেছেন–

> তুই জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ। মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য যাহাতে তোকে কোনো দুরাচার পুরুষের গলগ্রহ না হইতে হয় আমি তোকে সেইরূপ শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিব।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসঙ্গ এনে বলেছেন শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের স্ব-উপার্জনের কথা–

> কেহ শিক্ষয়িত্রী পদলাভের উপযোগী শিক্ষা লাভ করেন, কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন; কেহ রোগী সেবা করেন। ফল কথা এ বিভাগে রমণীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করেন।

স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়ে আত্মনির্ভরতার জন্য, সমাজের উন্নয়নের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভের তাগিদ দিয়েছেন বেগম রোকেয়া– 'আমরা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। আমাদিগকে সকলপ্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।'

সহিংসতা, নষ্টদের হাত থেকে রক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য আত্মরক্ষার কৌশল ও ব্যায়াম বিষয়ে প্রশিক্ষণের গুরুত্বারোপ করে তিনি লিখেছেন– 'শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম শিক্ষা দেয়া প্রশস্ত।'

নারীকে দেওয়া হতো না শ্রমের ন্যায্য মজুরি। পুরুষ যা পায় নারী তার প্রায় অর্ধেক পায়। নারীদের শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী হতে সাহস জুগিয়ে রোকেয়া বলেছেন– 'উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামীর' গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?' নারীর শ্রমের যে পারিশ্রমিক তা পুরুষের চেয়ে কম কেন সে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

এমন প্রত্যয়ী ভাবনা নারীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতেই তিনি 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধটি লিখেছেন। নারীদের আত্মচেতনা সবার আগে দরকার। সেজন্যই তিনি বলেছেন– 'যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের।' শেষে তাঁর আবেদন– সমাজের অর্ধেক অংশ নারী পিছে পড়ে থাকলে সমাজও সামনে এগুবে না। তাই নারীদেরকেই জয় করতে হবে আপন ভাগ্য। জাগ্রতচিত্তে সম্মুখযাত্রী হতে হবে।

আবার পণপ্রথা, যৌতুক, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, নিয়ম-রীতি না মেনে তালাক প্রথা সমাজের গভীর ক্ষত। তিনি এসবের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তালাক বিষয়ে জীবনের শেষ লেখা 'নারীর অধিকার' প্রবন্ধে তাঁর কষ্টজাত অনুভব– 'আমাদের উত্তরবঙ্গে দেখেছি, গৃহস্থ শ্রেণির মধ্যে সর্বদা তালাক হয়, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে।' এর বিরুদ্ধে সোচ্চার বেগম রোকেয়ার দাবি– বিয়ে যখন দুজনের সম্মতিতে হয় তালাক কেন শুধু পুরুষের ইচ্ছেতে হবে? তালাকের পাশাপাশি বৃদ্ধদের তরুণী ভার্যা গ্রহণের প্রবণতার বিরুদ্ধেও আঙুল তুলেছেন তিনি।

বেগম রোকেয়া অন্যত্র লিখেছেন–

> অনেক সময় অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা, ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত

> অথবা দুশ্চরিত্র পানাসক্ত পাত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া বুক-ভাঙ্গা রোদনে বক্ষ ভিজাইতে থাকে– সেই হৃদয়বিদারী অশ্রু প্রবাহের মধ্যেই বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

তালাক এবং বৃদ্ধদের বালিকা বিয়ের বেদনার কথা রোকেয়া উপস্থাপন করে গেছেন অনেক অনেক বছর আগে। তিনি এগুলো বন্ধ করার জন্যও নারীদের শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা অর্জনের কথা বলেছেন।

তাঁর 'সুলতানার স্বপ্ন' নারীর মর্যাদা, ক্ষমতায়নের স্বপ্নেরই বহিঃপ্রকাশ। রূপকের আড়ালে নারীস্থানের সজীব ছবি এঁকেছেন বেগম রোকেয়া। যেখানে নারীরাই সামগ্রিক কর্মের প্রধান নিয়ন্তা, স্বাধীন, অবরোধমুক্ত। এ গ্রন্থে রোকেয়ার বিজ্ঞানচেতনার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বাকস্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা নারীর মর্যাদার জন্য যেমন আবশ্যক তেমনি মাতৃসত্তার যথাযথ বিকাশের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ নির্মাণ সম্ভব। তিনি সুগৃহিণীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন জোর দিয়ে। কারণ একজন মা-ই পারেন সন্তানকে সুশিক্ষিত করে তুলতে। তাঁর মতে, সমাজ ও জাতির নির্মাতা এজন সুগৃহিণী। অর্থের সঠিক ব্যবহার, গৃহকে স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত রাখা, খাদ্যপুষ্টি, শিশুর যথাযথ সেবা, লালনপালন বিষয়ে গৃহিণীর ভূমিকা ব্যাপক। টেকসই উন্নয়নে পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বহুকাল আগেই 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধে ইতিবাচক এ কথাগুলো বলে গেছেন তিনি।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অনেক অনেক কাল আগেই তিনি 'শিশু পালন' প্রবন্ধে শিশু সুরক্ষার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। শিশু মৃত্যুর আশঙ্কাজনক পরিসংখ্যান দিয়ে বেগম রোকেয়ার চাওয়া–

> ... রোজ ১৪ জন করে শিশু কেবল মা ও ধাইয়ের অযত্নে বলি দেওয়া হয়েছে। অযত্নে ছেলে মারা হয়েছে, এর অর্থ এই যে পোয়াতিরা ঠিকমত যত্ন করতে জানে না। কারণ যাই হোক, এরকম শিশু হত্যা তো সহজ নয়, এর প্রতিকার করতে হবে।

কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন– 'শিশু হামারির আর একটা বিশেষ কারণ আমাদের দেশের বাল্যবিবাহ।' শিশুহত্যা, ধর্ষণ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের বিরোধিতা করেছেন রোকেয়া। এজন্য নারীসহ সবার সচেতনতা প্রত্যাশিত ছিল তাঁর।

বর্তমান কৃষি উন্নয়নে, উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষকের জীবনের সার্বিক মান উন্নয়নে দেশীয় ও বৈশ্বিক যে পরিকল্পনা, সে ভাবনাও ভেবেছিলেন বেগম রোকেয়া অনেককাল আগেই। রোকেয়ার চেতনার মূল্যায়ন অতঃপর উন্নয়ন গ্রন্থে 'রোকেয়া গবেষণা কৃষি ও কুটিরশিল্প ভাবনা' প্রবন্ধে বলা হয়েছে–

> তিনি বাঙালি জাতির দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলার কৃষি, কৃষক, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিকাশ নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করেছেন।...তাঁর 'এণ্ডি শিল্প' এবং 'চাষার দুক্ষু' শীর্ষক গবেষণামূলক একাধিক প্রবন্ধে নারী উন্নয়ন, দারিদ্র্য, কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা তুলে ধরেছেন।

রংপুরের দারিদ্র্য ও মঙ্গা নিয়ে লিখেছেন–

> রংপুর জেলার কোন কোন গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, শাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত।...শীতকালে দিবাভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্রে যাপন করিত। রাত্রিকালে শীত অসহ্য বোধ হইলে মাঝে মাঝে উঠিয়া পাটখড়ি জ্বালিয়া আগুন পোহাইত।

একশ বছর আগে বেগম রোকেয়া কৃষকের স্বনির্ভরতার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন– 'কৃষক রমণী স্ব-হস্তে চরকায় সুতা কাটিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের কাপড় প্রস্তুত করিত। আসাম ও রংপুর জেলায় এক প্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় 'এণ্ডি' বলে।... এই শিল্প তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া।'

চাষার দারিদ্র্য অবসানে কার্পাসের চাষ, এণ্ডি সুতার প্রচলনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর বক্তব্য– 'আসাম এবং রংপুর বাসিনী ললনাগণ এণ্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্রক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লীগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।'

শিক্ষা ও কুটিরশিল্প যে দারিদ্র্য ঘোচাতে পারে গবেষণাধর্মী চেতনায় তার সত্যতা তুলে ধরেছেন রোকেয়া। তিনি গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বিস্তারের কথা বলেছেন।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা ব্যাপক। প্রেরণা হিসেবে যেতে হবে বেগম রোকেয়ার সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' এর কাছে। প্রতিষ্ঠা ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা মার্চ। মূল লক্ষ্য– দীর্ঘকালের সামাজিক কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজে, পারিবারিক জীবনে সকল দিক দিয়া তাঁহারা আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইবেন। আর্ত-পীড়িত, বয়স্ক নারীগণের সাহায্য করাও ছিল এ সংগঠনের দায়িত্ব। এ সংগঠন থেকেই পরবর্তী নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার দৃষ্টান্ত মেলে *পদ্মরাগ* উপন্যাসের তারিণী ভবনে– 'কি সুন্দর সাম্য! মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান– সকলে যেন এক মাতৃ-গর্ভজাতা সহোদরার ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া কার্য করিতেছে।'

মাতৃভাষা নিয়েও ভেবেছেন বেগম রোকেয়া। বেদনাবোধ নিয়ে বলেছেন– 'স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন– অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই।...বাংলার অধিবাসী হয়েও বলেন যে, তারা বাংলা ভুলে গেছেন।'

রোকেয়ার বিশ্বাস শিক্ষালাভের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী সমাজ গড়ে উঠলে থাকবে না গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি লোপ পাবে, মাতৃভাষা ও দেশের প্রতি জাগবে প্রেম।

বেগম রোকেয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের গর্বিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সব স্তরেই নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গ্রহণ করেছেন ইতিবাচক নানা পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ। নারী-পুরুষ সবার অংশগ্রহণে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে– এ উপলব্ধি থেকেই বেগম রোকেয়ার ইতিবাচক ভাবনাগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলস শ্রম দিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বেগম রোকেয়া নারী উন্নয়নে ইতিবাচক ভাবনার সারথি, তাঁর ইতিবাচক ভাবনাগুলো ও তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রতী হতে হবে আমাদের। সবাই তাঁর চেতনা ধারণ করলেই অপসারিত হবে নারীমুক্তির সব বাধা, উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে সহজেই।

লেখক: ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

বিজয়ের পর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী জনগণের ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা

কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ

প্রত্যয় জসীম

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কবিদের কবিতায় বার বার উঠে এসেছে। শিল্প-সাহিত্যের নানা মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো– বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিরা তাদের হৃদয় উৎসারিত চরণ রচনা করেছেন বহু বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে। কবিদের কলমেই প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে পনেরোই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের। একাত্তর সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এক গৌরবগাথা। হাজারো প্রাণের আত্মাহুতি আর অসংখ্য নারীর সম্ভ্রম হারিয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা, লালসবুজের ঐ পতাকা। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা, বেদনার করুণ আর্তনাদ, হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন, বীরের আত্মত্যাগ, দেশ মাতৃকার জন্য মানুষ যেভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা এক অপার বিস্ময়। রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রণোদনা দিয়েছিল গান-কবিতা। আমাদের একটি নতুন জাতি-রাষ্ট্রের সূচনালগ্নে আমরা যাত্রা করেছি একটি নতুন পৃথিবীর দিকে। আর অনিবার্যভাবে এ যাত্রাপথে শিল্প-সাহিত্যের নানা মাধ্যমের উপস্থিতি মুখ্য হয়ে ওঠে। ভাস্কর, চিত্রশিল্পী, গল্পকার, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সংগীতশিল্পী– সকলেই মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে তাদের সৃজনপ্রতিভার উৎসারণ ঘটিয়েছেন। কবিরা কবিতা লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ কবিতায় ধরা দিয়েছে বহুমাত্রিকতায়। বাংলা কবিতার অন্যতম দিকপাল জসীম উদ্‌দীন তাঁর 'মুক্তিযোদ্ধা' কবিতায় লিখেছেন–

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে
ভয়াল বিশাল নখর মেলিয়া দিবস রজনী জাগে–
কখনো সে ধরে রাজাকার বেশ, কখনো খান-সেনা,
কখনো সে ধরে ধর্ম লেবাস পশ্চিম হতে কেনা
কখনো সে পশি ঢাকা-বেতারের সংরক্ষিত ঘরে
ক্ষেপা কুকুরের মরণ কামড় হানিছে ক্ষিপ্ত স্বরে।
...
আমরা চলেছি রক্ষা করিতে মা-বোনের ইজ্জত
শত শহীদের লোহুতে জ্বালানো আমাদের হিম্মত...।

পল্লি কবি খ্যাত জসীম উদ্‌দীন তাঁর বহু কবিতায় এভাবেই তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ।

নারী জগরণের পথিকৃৎ ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। 'উদাত্ত বাংলা' কবিতায় তাঁর আশান্বিত উচ্চারণ–

সাতকোটি সন্তানের স্বেদে অবগাহি
বাংলার জননী আছে উর্ধ্বমুখে চাহি
সে প্রভাত তরে–
মুক্তির আলোক শিখা পশিবে যে প্রতি ঘরে ঘরে।
সেই শুভদিন লাগি পথ চাহি জাগে।
জননী-ভগিনী-বধূ বিধাতার আশীর্বাদ মাগে।

আহসান হাবীব তাঁর 'স্বাধীনতা' শীর্ষক কবিতায় বলেন–

আমি অতঃপর সরোবর এবং নদীকে
ডেকে ডেকে যখন মিনতি করি

এস, আমার সমস্ত বুকে
বুক পুড়ে স্বাধীনতা হও
সারা বুকে ছড়াও অথবা
মায়ের দোলনা হও...।

সিকান্দার আবু জাফর তাঁর 'বাংলা ছাড়ো' কবিতায় অবিনাশী প্রত্যয়ে বলেন–

রক্ত চোখের আগুন মেঘে ঝলসে
যাওয়া
আমার বছরগুলো
আজকে যখন হাতের মুঠোয়
কণ্ঠনালীর খুনপিয়াসী ছুরি
কাজ কি তবে আগলে রেখে
বুকের কাছে
কেউটে সাপের ঝাঁপি।
আমার হাতেই নিলাম আমার
নির্ভরতার চাবি;
তুমি আমার আকাশ থেকে
সরাও তোমার ছায়া
তুমি বাংলা ছাড়ো...।

শামসুর রাহমান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শিল্পসম্মত বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কবিতা হচ্ছে– 'এখানে দরজা ছিল', 'সম্পত্তি', 'পথের কুকুর', 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা', 'স্বাধীনতা তুমি', 'তুমি বলেছিলে', 'কাক' প্রভৃতি।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' কবিতায় লিখেছেন–

তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।

হাসান হাফিজুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। 'তখন সকল শব্দই' শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখেছেন–

আমার নিশ্বাসের নাম স্বাধীনতা
আমার বিশ্বাসের নখর ক্রোধের দারুণ রঙে রাঙানো
দুঃস্বপ্নের কোলবন্দী আমার ভালবাসা
এখন কেবলই
এক অহরহ চিৎকার– হত্যা কর- হত্যা কর- হত্যা কর।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তাঁর 'আমার দুখিনী বাংলা' কবিতায় লিখেছেন–

আমার দুখিনী বাংলা
মা, তুই আমার জননী
তোর ওই আকাশে চাঁদ
আর দিনে হাসে দিনমণি।
তবু তোর চোখে কেন অশ্রুভরা জল
মা তুই অহল্যা হলি
কার শাপে বল?

সৈয়দ শামসুল হক আমাদের প্রধান লেখকদের একজন। তাঁর গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটকে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য কুশলতায় ধরা দিয়েছে। 'জগন্নাথ হল' কবিতায় লিখেছেন–

দুলে দুলে উঠছে ফুলের অজস্র পতাকা
ওধাও ছাত্রদের মাঠে
ঘাসের বেয়নেটগুলো আকাশের দিকে স্থির পাশেই
ছিন্ন একটা স্তনের বোঁটা মুখে
সমস্ত নিস্তব্ধতায়
দীর্ঘ ছায়া ফেলে
সৈনিক
সূর্যাস্তের প্রতিফলন তার দাঁতে।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসাধারণ কিছু কবিতা লিখেছেন। 'আরো কত রক্ত দিতে হবে' কবিতায় তিনি বলেন–

বারবার মনে পড়ে
রক্তের মাটি খুঁড়ে লেখা
কতিপয় কথামালা
যা কখনো ছাপা হয় নাই
যাঁর লেখা সেই তিনি অকালপ্রয়াত
মূলত সাংবাদিক
এবং সে সুবাদেই এই দেশে আগমন
অসীম রায়ের।

আল মাহমুদের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে বহুবার। 'অসহ্য সময় কাটে' কবিতায় লিখেছেন–

জনতার সমুদ্রের সাথে

বাঘের হাতের নখের মতো শপথ
সোহাগের গাঢ় ইচ্ছা নিয়ে
নেমে আসে মনের ওপর।
নির্মম আদর পেয়ে আমিও রক্তাক্ত হব
বরকতের শরীরের মতো?

বেলাল চৌধুরী 'শহীদদের প্রতি' কবিতায় লিখেছেন–

তোমাদের যা বলার ছিল
বলছে কি তা বাংলাদেশ?
শেষ কথাটি সুখের ছিল?
ঘৃণার ছিল?
নাকি ক্রোধের
প্রতিশোধের
কোনটা ছিল?

রফিক আজাদ আমাদের প্রধান কবিদের একজন। তাঁর বহু লেখায় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এসেছে। 'নেবে স্বাধীনতা' কবিতায় তিনি লিখেছেন–

নেবে স্বাধীনতা? – নাও তোমাকে দিলাম
অপার আকাশ-উড়বে যদি একটি বেলুন দেব,
হিলিয়াম গ্যাস- ভরা রঙিন বেলুন–
মধ্য আকাশের বায়ুস্তর ভেদ করে তুমি বেশ
নিশ্চিন্তে পেরিয়ে যাবে বাংলার আকাশ...।

শামসুল ইসলাম তাঁর 'বসন্ত সম্পাতে এক নারী' কবিতায় লিখেছেন–

তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি
মুখের আদল
এই মুখ হতে খুলে ফেলি
তোমার কণ্ঠের গান এই কণ্ঠে মিশে যায় যদি
ঘুরি একা একা উদাসীন।
এখনই সাক্ষাৎ দেবে এই পথে
বসন্ত সম্পাতে
এক নারী
অদ্বিতীয়– আমি তাকে চাই
তাই তোমাকে নেব না
তুমি যাও।

নির্মলেন্দু গুণ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বহু কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর 'আগ্নেয়াস্ত্র' কবিতায় লিখেছেন–

পুলিশ স্টেশনে ভিড়, আগ্নেয়াস্ত্র জমা নিচ্ছে শহরের
সন্দিগ্ধ সৈনিক। সামরিক নির্দেশে ভিত মানুষের
শর্টগান, রাইফেল, পিস্তল এবং কার্তুজ যেন দরগায়
স্বীকৃত মান্ত– টেবিলে ফুলের মতো মাস্তানের হাত।

মহাদেব সাহা তাঁর 'তোমার জন্য' কবিতায় লিখেছেন–

তোমার জন্য জয় করেছি একটি যুদ্ধ
একটি দেশের স্বাধীনতা
তোমার হাসি, তোমার মুখের শব্দগুলি
সেই নিরালা– দূর বিদেশে আমার ছিল
সঙ্গী এমন
অস্ত্র কিংবা যুদ্ধজাহাজ ছিল না তো সেসব কিছুই
ছিল তোমার ভালবাসার রাঙা গোলাপ
আমার হাতে...।

হাসান হাফিজ তাঁর 'না' কবিতায় লিখেছেন, অবিনাশী এক পঙ্‌ক্তি–

না, আমরা কাপুরুষ নই,– না।

প্রত্যয় জসীম তাঁর বহু কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। 'সিঁদুর সন্ধ্যা' কবিতায় তিনি লিখেন–

সিঁদুর সন্ধ্যাগুলো কাঁদে এখনো
মৃত্যুর আনন্দ মিছিলে
মিশে গ্যাছে যারা বুঝেছে তারা
প্রিয় পতাকার রং কেন লাল
সিঁদুর সন্ধ্যা আমি তোমার জন্য
কাঁদি নীরবে নীরবে
কাঁদবো হাজার বছর ধরে...।

প্রবীণ কবিদের পাশাপাশি এভাবে নতুন প্রজন্মের কবিদের কবিতাতেও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। অনাগত দিনের কবিরাও তাদের কলমের কালিতে তুলে ধরবেন আমাদের শ্রেষ্ঠতম বৃহত্তম অর্জন স্বাধীনতার স্বপ্নগাথা। কবিরা স্বপ্ন দেখে একটি সুন্দর স্বদেশের। স্বাধীনতার সুফল যেন সব মানুষের প্রাণের গহীনে দোলা দিয়ে যায় সেই প্রত্যাশা আমাদের।

লেখক: কবি, কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক

পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন সেবা চালু

সাইবার জগতে সংঘটিত নারীর প্রতি হয়রানিমূলক অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' নামে ফেসবুক পেজ চালু করেছে পুলিশ। এছাড়া ইমেইল আইডি ও হটলাইন নম্বরও চালু করেছে পুলিশ সদর দফতর। যেসব নারী সাইবার বুলিং, আইডি হ্যাক, স্পর্শকাতর তথ্য, ছবি, ভিডিও প্রকাশ ও সাইবার জগতে যৌন হয়রানি ইত্যাদির শিকার হচ্ছেন, তারাই এখানে অভিযোগ জানাতে পারবেন। সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় রেখে এবং ভুক্তভোগীর তথ্য গোপন রেখে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা ও আইনি সহায়তা দেওয়া হবে। ১৬ই নভেম্বর রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস অডিটোরিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. বেনজীর আহম্মেদ এ সেবার উদ্‌বোধন করেন।

পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে, সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনে হওয়া সাত হাজার মামলার বেশির ভাগই ভুক্তভোগী নারী। এছাড়া অনলাইন ব্যবহারকারী ১০০ জন নারীর মধ্যে ৭৩ জনই সাইবার বুলিং বা হয়রানির শিকার হন। সাইবার অপরাধ দমনে পুলিশের অন্তত পাঁচটি ইউনিট থাকলেও পুলিশ সদস্য নিয়ে পরিচালিত হওয়ায় সেগুলোতে যান না নারীরা। এ বাস্তবতায় শুধু নারী পুলিশ সদস্যদের পরিচালনায় 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' নামে নতুন ইউনিট গঠন করেছে পুলিশ সদর দফতর।

প্রতিবেদন: সোমা হক

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২৩ বছর: পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস

রেহানা শাহনাজ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই বর্তমান সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা পার্বত্য শান্তিচুক্তি নামে পরিচিত। বিশ্ব ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্মারক।

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপার আধার বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলা নিয়ে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর

পার্বত্য অঞ্চল। যুগ যুগ ধরে পাহাড়ে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বর্ণিল জীবনাচার, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। পার্বত্য জেলাগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের বিশেষ উদ্যোগ নেন। শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই চুক্তি একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অঞ্চল। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। শান্তিচুক্তির ফলে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবকাঠামোসহ আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম আধুনিকতার ছোঁয়া বিবর্জিত পার্বত্য অঞ্চলকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনেন। জাতির পিতা পার্বত্যবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের সব ধরনের সুযোগের ব্যবস্থা নেন। এলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের জুন মাসে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৯৭৫-পরবর্তীতে পাহাড়ি বাঙালি বিভেদ তীব্র হতে থাকে। খুন, অত্যাচার, অবিচার, ভূমি জবরদখল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার পাহাড়ি অঞ্চলকে আরো অস্থিতিশীল করে তোলে।

২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ সরকার। এই সরকার পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের পর এ অঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রমে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। পার্বত্য জেলার স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের অনেক উন্নয়ন ঘটেছে। স্থাপিত হয়েছে রাঙামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী ধাপে ১৯৯৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করে অশান্তি ও হানাহানির পথ ছেড়ে শান্তি, সম্প্রীতি ও অগ্রগতির অভিযাত্রায় শামিল হন। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিদ্যমান আইনসমূহ সংশোধন করে তিনটি জেলা পরিষদকে বহুলাংশে শক্তিশালী করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স। ১৯৯৮ সালের ১৫ই জুলাই সৃষ্টি করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এক নবযাত্রার সূচনা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি, ক্রীড়া, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও আয়বর্ধনমূলক খাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

উত্তপ্ত পাহাড়ে যে সকল পরিবার পার্শ্ববর্তী দেশে শরণার্থী হয়েছিল, তারা ফিরে আসে মাতৃভূমিতে। তাদের প্রয়োজনীয় এবং প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধাসহ পুনর্বাসন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিধিমালা, ২০১৮ জারির লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের

প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, এমপি (মন্ত্রী পদমর্যাদা)'কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

শান্তিচুক্তির শর্তানুযায়ী চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ, ১৫টি আংশিক এবং অবশিষ্ট ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন ৩০টি বিভাগ/বিষয় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২৯টি বিভাগ/বিষয় এবং ২৮টি বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে। বর্ণিত বিভাগ/বিষয়গুলো হস্তান্তরের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কর্মপরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পার্বত্য মানুষের সেবা প্রাপ্তির স্থান নিকটবর্তী ও সহজলভ্য হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি তদারকির দায়িত্ব রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টা, পার্বত্যবাসীর প্রতি তাঁর উদার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পার্বত্য এলাকার শান্তি ও উন্নয়নের অভিযাত্রা বেগবান হয়েছে।

করোনা মহামারির মধ্যেও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার তথা পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের সংস্কৃতি ও পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য দেশবাসীর কাছে পরিচিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর ঢাকায় পার্বত্য মেলার আয়োজন করা হয়। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে এ এলাকার উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বনায়ন, পর্যটন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে অনেক প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৮৪২.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় ২৮৮টি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে টি.আর খাতে ৮০,০০০ (আশি হাজার) মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং জি.আর খাতে ৮,০০,০০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটে মোট ৮৬৪.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৯টি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ৩টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদ, গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য গৃহ প্রদান, তিন পার্বত্য জেলায় তরুণ-তরুণীদের অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ও পার্বত্য এলাকার পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে মাউনটেন বাইকিং, ক্যানিওনিং, পার্বত্যারোহণ, ট্রেকিং ইত্যাদি ইভেন্টসের আয়োজন। এসব অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস কার্যক্রম শিক্ষা অর্জন, অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ ক্রীড়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৪ই জুন ১৯৭৫ সালে রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্‌বোধনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'মুজিববর্ষে' বেতবুনিয়াস্থ সজীব ওয়াজেদ স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যাল উদ্‌বোধন, তিন পার্বত্য জেলায় ৬টি 'Smart Village' স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, যদি পার্বত্যবাসীদের স্বায়ত্তশাসন মেনে নেওয়া হয়, সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। বর্তমান সরকার পাহাড়ি বাঙালি ভাই-ভাই এই নীতিতে বিশ্বাসী। সাংবিধানিকভাবে পাহাড়িরা এদেশের নাগরিক। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শান্তিচুক্তির সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর পারস্পরিক সহনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

তুরস্কে স্থাপিত হবে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য

তুরস্কের রাজধানী আংকারায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপিত হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত। তিনি আরো জানান, ঢাকাতেও আধুনিক তুরস্কের পিতা কামাল আতাতুর্কের ভাস্কর্য স্থাপন করা হবে। তুর্কি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকের পর তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির অনেক মিল রয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আসবেন বলে সম্মতি জানিয়েছেন।

প্রতিবেদন: কাবেরী বসু

একটি মুজিবীয় দিন

মনজুর-ই-আলম ফিরোজী

বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি দিনক্ষণই ছিল ইতিহাসের অমোঘ সাক্ষী। তিনি ছিলেন মাটি ও মানুষের প্রিয় মুখ। দেশের অবহেলিত, বঞ্চিত, আর্ত-পীড়িত মানুষের জীবনমানের পরিবর্তনে তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম তাঁকে সাধারণ মানুষের প্রিয় নেতায় পরিণত করেছিল। তিনি মানুষের কথা দরদ দিয়ে শুনতেন। তাদের দুঃখ-কষ্টকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। সাধারণ মানুষের কষ্ট-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা ও ভোগান্তি নিরসনার্থে তাঁর অসাধারণ চিন্তাচেতনা ও নিরলস শ্রম তাঁকে ইতিহাসে অমর করেছে।

সাধারণ জনারণ্যে বঙ্গবন্ধুর ছিল অসম্ভব জনপ্রিয়তা। তাঁর স্নেহধন্যে চমকিত হাজারো মানুষ তাদের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে হাজারো ঘটনার অবতারণা করেছেন। আমি এরকম একটি ছোট্ট ঘটনা উপস্থাপন করছি, যা থেকে সহজেই অনুমিত হবে, কেন মুজিব মানুষের মনে স্থান করেছেন।

জনাব আবু আল খসরু স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরে অডিটর পদে চাকরি করতেন। ২০১৫ সালের মে মাসে তিনি অবসরে গমন করেছেন। এখন তিনি একজন নামকরা হোমিও চিকিৎসক। নারায়ণগঞ্জের মিজমিজিস্থ নিজ বাড়ির চৌহদ্দিতে স্থাপিত হোমিও চিকিৎসালয়ে খুব ব্যস্ত সময় পার করেন। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর এবং বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

জনাব খসরু একজন অসম্ভব মুজিবভক্ত। কী বাসা, কী অফিস, কী রাস্তাঘাট, সর্বত্রই তার মুজিব বন্দনা চলত এবং এখনো চলে। এই মুজিবভক্তির কারণ কী? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি তার বাবা ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে ঘটিত একটি চমৎকার বিষয়ের অবতারণা করেন। তার বাবা সিদ্দিকুর রহমান পুলিশবাহিনীতে চাকরি করতেন। পুলিশে চাকরিতে যখন যেখানে পদায়ন করা হয়, বিনা বাক্যব্যয়ে সেখানেই যেতে হয়। কিন্তু তারপরও কপালের লিখন যদি হয় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ডিউটি? সেটা যে কত সৌভাগ্যের তা বলাই বাহুল্য। ১৯৭৫ সালের মার্চ-এপ্রিলে সিদ্দিকুর রহমানের ভাগ্যে সেটি জুটেছিল। ঐ মাহেন্দ্রক্ষণটিতে তাকে ঐতিহাসিক 'ধানমন্ডি ৩২' নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে পদায়ন করা হয়। তিনি ৩২ নম্বর ভবনের আঙিনাস্থ (টিনশেডের) পুলিশ ফাঁড়িতে থাকতেন।

একদিন খসরু সাহেবের বাবা বাইরে কোথাও কাজে গিয়েছিলেন। তার পরনে তখন পুলিশের পোশাক ছিল না। ছিল সাধারণ পোশাক লুঙি ও শার্ট। যথারীতি কাজ শেষে তার ফাঁড়িতে ফিরছিলেন। তিনি যখন ৩২ নম্বর ভবনের ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবেন ঠিক একই সময় বঙ্গবন্ধুর জিপ গাড়িটি গেটের বাইরের দিকে যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু গাড়িতে বসেছিলেন। খসরু সাহেবের বাবা বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ করে স্যালুট দিলেন।

ব্যাপার কী? লুঙি-শার্ট পরা মাঝবয়সি একজন মানুষ। কিন্তু সালাম ঠুকল ফৌজি কায়দায়। বিষয়টি রহস্যজনক মনে হলো। বঙ্গবন্ধু ড্রাইভারকে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিলেন। শুধু তাই নয়। গাড়িটি ব্যাক করে ভেতরে ঢুকানো হলো। খসরু সাহেবের বাবা যথাস্থানে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। তাকে গাড়ির নিকটে ডাকা হলো।

খসরু সাহেবের বাবার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে; না জানি কোন অপরাধ করে ফেলেছেন। এবার না জানি কোন খেসারত দিতে হয়?

গাড়ির কাছে এলে বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্যালুট দিলে কেন?

স্যার আমি পুলিশের লোক। আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্বে

জনগণের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

নিয়োজিত আছি।

ও তাই বলো। আমি তো মনে করলাম তুমি কোনো দূর-দূরান্ত থেকে কোনো কাজে আমার কাছে এসেছ। এ কারণে গাড়ি ব্যাক করালাম।

না স্যার। আমি পুলিশ। আর থাকি এখানেই– ফাঁড়িতে।

ঠিক আছে। ভালো থাকো। আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবে, কেমন?

ঠিক আছে স্যার। বলে আরেকবার স্যালুট দিলেন।

গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু গাড়ির জানালা আবার খুললেন। খসরু সাহেবের বাবাকে ইশারা দিলেন আরো কাছে আসতে। কাছে এলে বললেন– শোন, তোমার পরনে তো ইউনিফর্ম নেই। তুমি লুঙি আর শার্ট পরে আছ। যেহেতু ইউনিফর্ম নেই, তাছাড়া এখন প্রটোকলের দায়িত্বও পালন করছ না, তাই তোমাকে স্যালুট না দিলেও চলবে। বুঝতে পেরেছ?

আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। আপনার আদেশ শিরোধার্য। এখন থেকে আপনার কথামতো চলব।

প্রিয় নেতার এহেন ব্যবহারে জনাব সিদ্দিকুর রহমান অভিভূত হয়ে গেলেন। এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ আরো বেড়ে গেল। তিনি এরপর যেদিন বাড়ি গেলেন, সেদিন স্ত্রী-সন্তানদের একত্রিত করে ৩২ নম্বরের ঘটনাটি বললেন এবং বললেন যে, মহৎ হৃদয়ের মানুষের চলনে, বলনে, আচরণে শুধুই কল্যাণ নিহিত থাকে। তাঁরা সবই করেন জনগণের মঙ্গলের জন্য। তিনি তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর মহৎ অন্তঃকরণের প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উপদেশ দিলেন।

সেই থেকে তার সন্তানেরা বঙ্গবন্ধুর একান্ত ভক্ত। ফুরসত পেলেই তারা প্রিয় নেতার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটান। জনাব খসরু সাহেবের কাছে এটাও শুনেছি যে, বঙ্গবন্ধুর ভক্ত কোনো রোগী তার কাছে চিকিৎসা নিতে আসলে তিনি তাকে বিনামূল্যেই ওষুধ দিয়ে দেন।

এখনো মরহুম সিদ্দিকুর রহমানের পরিবার সশ্রদ্ধচিত্তে সেই মুজিবীয় দিনটির কথা স্মরণ করেন।

লেখক: অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার ও প্রাবন্ধিক

সফলতার পথে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি

ধরিত্রীর তাপমাত্রা কমিয়ে আনতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের দেশগুলো যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তা সফল হতে চলেছে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় তৈরি করা প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে চলেছে বলে জানিয়েছে শীর্ষস্থানীয় একটি জলবায়ু বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির নাম ক্লাইমেট অ্যাকশন। প্রতিষ্ঠানটির দাবি করছে, বিশ্বে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ দশমিক ১ সেলসিয়াস নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। চীনসহ অন্যান্য দেশের বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে কাজ করছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইতোমধ্যে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনতে যে ঘোষণা দিয়েছে তাতে অচিরেই সুফল মিলবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া সিমরান

শীতের রূপবৈচিত্র্য

মোশারফ হোসেন

বাংলার রূপবৈচিত্র্যের অনেকখানি জুড়ে শীতের অবস্থান। শীতকাল অন্যসব ঋতু থেকে আলাদা গুরুত্ব পেয়ে থাকে। শীত বাঙালির প্রিয় ঋতু। হেমন্তের সোনালি ডানায় ভর করে হিমেল হাওয়ার পথে নিয়ে কুয়াশার চাদর জড়িয়ে আসে শীতকাল। যে-কোনো ঋতুই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মহিমাময়। এসব কিছুর পরেও মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে শীত যেন বিশেষ আদরের, দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে প্রাপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল হলুদ পাতার ঝরা খামে চিঠি আসে শীতের। পৌষ-মাঘ এই দুই মাস শীতকাল। যদিও শীতের আমেজ শুরু হয়ে যায় হেমন্তের অর্থাৎ অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি সময়ে। হেমন্তের আমেজ শেষ হতে না হতেই প্রকৃতিতে শীতের বুড়ি এসে হাজির। কুয়াশার ঘন জাল সরিয়ে মিষ্টি রোদের সূর্য নতুন মাত্রা যোগ করে শীতের সকালে। কবি মন তাই খুশিতে গেয়ে ওঠে–

মেঘ ছিঁড়ে ধীরে ধীরে সূর্যের মুখ
রোদে রোদে ভরে দেয় জীবনের সুখ।

শীতের সকাল অন্যান্য সকাল থেকে একটু পৃথক, একটু বৈচিত্র্যময়। শীতের সকাল আসে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে। শীতের সময় গাছের পাতা ঝরে যায়। ঘন কুয়াশার কারণে সূর্যের দেখা পাওয়া যায় না। যত দূর চোখ যায় কেবল কুয়াশা ঘেরা অন্ধকার প্রকৃতি। এ সময় লেপ-কাঁথা ফেলে বিছানা ছেড়ে কেউ বাইরে যেতে চায় না। কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে সূর্য আলো ছড়াতে থাকে। হিমশীতল হাওয়া বইতে থাকে ধীরে ধীরে। গাছপালা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে শিশির। সূর্যের উত্তাপ না ছড়ানো পর্যন্ত কেউ ঘর ছেড়ে বাইরে বের হতে চায় না। সেসময় সবার গায়ে শীতের পোশাক জড়ানো থাকে। বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আগুন জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে দেখা যায়। সূর্যের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়লে কুয়াশা কেটে যায়। গ্রামের প্রকৃতির চারদিক থেকে ভেসে আসে সরষে ফুলের মধুর সৌরভ। ঘাসের ডগায়, পাতার কিনারায় রাতের শিশিরকণা সূর্যালোকে ঝলমল করে হাসতে থাকে। শীতকালে নদীনালা, খালবিল, পুকুর, ডোবা সব শুকিয়ে যায়। কৃষকেরা সকাল হতেই গরু আর লাঙল নিয়ে বের হয়ে যায়। তারা ক্ষেতে মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর, সরিষার বীজ বোনে। কিছুদিন পর যখন সেগুলোর কচি পাতা মাথা উঁচু করে তখন চারদিকে বিরাজ করে এক অপূর্ব স্নিগ্ধতা, কোমলতা। এসময় কৃষক শীত কাটানোর জন্য চড়া গলায় গান ধরে–

ওকি গাড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের পানে চাইয়া রে...।

গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে তখন নতুন ধানের চালে তৈরি হয় সুস্বাদু সব শীতের পিঠা। অফুরন্ত অবসর গ্রামবাংলার প্রকৃতিতে শীত যেন এক অকৃপণ দাতা।

শীতের আগমনে গ্রামবাংলা আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। মাঠে মাঠে সোনালি ধান আর ক্ষেতে ক্ষেতে সবুজ শাকসবজি যেমন– লালশাক, পালংশাক, ঘৃতকাঞ্চন, ওলকপি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিটকপি, মূলা, গাজর, টমেটোসহ নানারকম শাকসবজি আর ফল-ফলাদিতে গ্রামবাংলার প্রতিটি বাড়ি রমরম করে। খালবিলে কৈ, মাগুর, শৈল, টাকি, পাবদা, পুঁটিসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সমারোহ গ্রাম্য জনজীবনে এক স্বস্তির নিশ্বাস এনে দেয়। কৃষকের ঘরে ঘরে উঠোনে উঠোনে ধানে ভরে যায়। কৃষান-বধূরা সেই ধান রোদে শুকিয়ে ঢেঁকি দিয়ে ধান ভানে। আতপ চাউল গুড়া করে। সেই চাউলের গুড়া দিয়ে নানান রকম পিঠা তৈরিতে বসে যায়। এসব পিঠার মধ্যে– তেলের পিঠা, চিতই পিঠা, ভাপা পিঠা অন্যতম। এসময় খেজুর গাছ থেকে খেজুর রসের ঠিলে নামিয়ে আনে গাছিরা। তখন গ্রামের ঘরে ঘরে খেজুর রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে। খেজুর রস ও চালের গুড়া দিয়ে ঘরের মা-বোনেরা তৈরি করে নানারকম পিঠা, পায়েশ। শীতের সকালে মিষ্টি রোদে বসে পিঠা ও মচমচে মুড়ি খাওয়ার মজাই আলাদা।

শীতের বিকাল বড়ো বেশি ক্ষণস্থায়ী। শহুরে বিকেলগুলো আরো স্থবির। কুয়াশা যখন চাদর মেলে, চারপাশে কেমন একটা মন খারাপের ছবি আঁকা হয়। দিন মিলিয়ে যাবার বেলায় প্রকৃতি বিষণ্ন হয় একটু।

গ্রামাঞ্চলে ঘরে ঘরে আর শহরের পথেঘাটে পিঠার পসরা বসে বিকাল হতে না হতেই। এদেশের শীতকালীন সংস্কৃতির একটি বড়ো অংশ জুড়েই রয়েছে পিঠাপুলির নাম। ভাপা এই পিঠার একটি। অন্য সময়েও তৈরি করা যায় বটে, কিন্তু ভাপা পিঠার প্রকৃত স্বাদ শীতকাল ছাড়া মিলবে না। আরো আছে চিতই পিঠা, সাথে হরেক রকমের ভর্তা। শীতের সন্ধ্যায় এই খাবারের স্বাদ জিভে জল আনবে না, তা ভাবাও মুশকিল। পাটিসাপটা, ক্ষীরপুলি, তেলের পিঠা, ঝাল পিঠা– পিঠাদের দল খুব ছোটো নয়। আরেকটা মজার জিনিস আছে শহরে, অন্যান্য খাবারের

আয়োজনে পুরুষ বিক্রেতাই বেশি দেখা গেলেও পিঠার দোকানে প্রচুর নারী বিক্রেতা দেখা যায়।

কেমন করে যেন শীতকাল একটি খেলাকেও নিজের মৌসুমের বানিয়ে নিয়েছে, সেটি হচ্ছে ব্যাডমিন্টন। শীত আসতে না আসতেই পাড়ায় পাড়ায় ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরির ধুম লেগে যায়। পাড়ায় কিছু খোলা জায়গা থাকলেই তাতে বেশ আয়োজন করে কোর্ট বানানো হয়। চাঁদা উঠানো হয় সবার থেকে। নেট কেনা, বাঁশ পুঁতে নেট বাঁধা, সীমানা কাটা, শাটল কর্ক কিনে রাখা। আর রাতে খেলার জন্য বাতির ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রিসিটির লাইন আনা– সে তো একটা উৎসবের সমান।

শীতকালে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানে ভ্রমণে বের হয়। এসময় ধর্মীয় পুণ্যার্থীরাও বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরতে যান। শীতে মুসলিম ধর্মের মানুষেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে তাবলিগ করতে বাহির হন। শীতকাল ভ্রমণের জন্য বিশেষ আরামদায়ক একটি ঋতু। কারণ এসময় গরম কাপড় পরিধান করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহুদূরের পথ ঘোরাফেরায় তেমন কোনো কষ্ট হয় না। শীতের সময় শহর এবং গ্রামে সর্বত্র ছেলেমেয়ে এমনকি বড়োদেরও বনভোজন করতে দেখা যায়। শীতে শহরে বনভোজন করাটা এখন একটা উৎসবে পরিণত হয়েছে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ এমনকি বিভিন্ন সংগঠনের মানুষজনদের কাছে শীতের বনভোজন করাটা একটা কালচারে পরিণত হয়েছে। তারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে শীতের সকালে বা সন্ধ্যায় নানারকম খাবারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বনভোজনের উৎসবে মেতে ওঠে। এসময় শহরের বিভিন্ন পিকনিক স্পট বনভোজনের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। গ্রামবাংলায় শীতের সন্ধ্যায় যাত্রা, জারি গান, পালা গান, গাজীর গান, মুর্শিদি এবং মারফতি গানের আয়োজন করা হয়। সারারাত্রি ধরে মানুষ এসব গান খুব মনোযোগ সহকারে শোনে। এসকল গান লোকায়ত বাংলার এক চিরায়ত ঐতিহ্য বহন করে। শীতকালে সারা শহরজুড়ে নানা জায়গায় বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে যেমন– পিঠা-পায়েসের মেলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। শীত ঋতু একদিকে আরামদায়ক অন্যদিকে কষ্টের। যাদের গরম কাপড়ের অভাব নেই শীত নিবারণের বস্ত্র আছে, শীত নিরোধক ঘরবাড়ি আছে তাদের কাছে শীতকাল অত্যন্ত আরামদায়ক। অন্যদিকে যাদের গরম কাপড় নেই, পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান নেই, বাসস্থান নেই, আশ্রয় নেই তাদের কাছে শীত ঋতু অতীব কষ্টদায়ক। তারা কেউবা ফুটপাতে, কেউবা রেললাইনের প্ল্যাটফর্মে হাড় কাঁপানো কনকনে শীতে জবুথবু হয়ে রাত্রিযাপন করে। তাই শীতকাল তাদের কাছে সৌন্দর্যের উৎস নয় বরং শীত বিদায়ের অপেক্ষায় থাকে তারা।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে, রাত বাড়ে। শীতের রাত সুদীর্ঘ। সময় কাটতে না চাওয়ার রাত, হিমঝরা হাড় কাঁপানো রাত আসে কখনো। রাস্তার ধারে আগুন জ্বেলে তার ধারে হাত-পা সেঁকে নেয় লোকজন। ভারী পোশাকে শীতকে মানিয়ে নেওয়ার কী ভীষণ চেষ্টা থাকে রাতের রাস্তায়।

এই শীতে আরো আসে বাইরের দেশের অতিথি পাখিরা। ভিসা বা পাসপোর্ট ছাড়াই বিদেশের সীমানায় ঢুকে যায় তারা, ডানাই যাদের ভরসা। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভরে যায় অসংখ্য অতিথি পাখির কোলাহলে। খালবিল, হাওড়ে এই অতিথি পাখিদের অবাধ বিচরণ থাকে শীতজুড়ে। তারা আসে নিজেদের দেশের ভয়ানক ঠান্ডা থেকে বাঁচতে। আর আমাদের দেশের জন্য সাথে নিয়ে আসে আনন্দের আরেক উপলক্ষ। হাজারো মানুষ ভিড় জমায় তাদের দেখতে, তারা যে অতিথি!

সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আলো-আঁধার– এসব নিয়েই আমাদের জীবন। আমাদের এগিয়ে চলা। তাই শীত যেমন কষ্টের তেমনি অনেক কিছু পাওয়ারও ঋতু। আমরা যদি গরিব-দুখিদের প্রতি সাহায্য ও মমতার হাত বাড়িয়ে দিই, তাহলে তারাও শীতের কষ্ট কাটিয়ে উঠতে পারবে। আমরা সবাই তখন শীতের আনন্দগুলো ভাগ করে দিতে পারব।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

ব্লুমনের মহাজাগতিক দৃশ্য

৩১শে অক্টোবর আকাশ উদ্ভাসিত করে হ্যালোইনের রাতে নীলাভ ঢাউস চাঁদ উঠেছিল। জ্যোতির্বিদরা সে চাঁদের নাম দিয়েছে 'ব্লুমন'। পূর্ণ চাঁদের আলোর জোয়ারে ভেসেছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রিয় উৎসব হ্যালোইন আর ব্লুমন। অক্টোবর মাসজুড়ে চলেছে আয়োজনের ঘনঘটা। কুমড়োর লণ্ঠন তৈরি, বাড়িঘর, রাজপথ সাজানো, চকলেট ও পেস্ট্রি তৈরিতে ব্যস্ত ছিল আয়োজকরা। ব্লুমনের উৎসবে মাতোয়ারা হয় ইউরোপ আর আমেরিকার জনগণ। দিন ঘনিয়ে সন্ধ্যা নামতেই বিভিন্ন রংবেরঙের ভূতুড়ে পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঐ রাতে সবাই আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। সর্বশেষ ১৯৪৪ সালে 'ব্লুমন' দেখা গিয়েছিল। এরপরে ২০২০ সালের ৩১শে অক্টোবর 'ব্লুমন' দেখা যায়। বছরে ১২টি পূর্ণিমা হয়। প্রতিমাসে একটি করে। কিন্তু অক্টোবর মাসে ২ বার পূর্ণিমা হয়। ফলে 'ব্লুমন' দেখা মেলে বলে জ্যোতির্বিদরা মনে করছেন। ইউরোপ- আমেরিকায় চারটি ঋতুই লক্ষণীয়। শীতের মৌসুমের তৃতীয় পূর্ণিমা হলো 'ব্লুমন' নীল চাঁদ দেখা গেলেও চাঁদের আলো পুরোপুরি নীল হয় না।

প্রতিবেদন: অমৃতা রায়

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় যুব দিবস

মো. মুশিউর রহমান

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বয়স এখন পঞ্চাশ। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। আর এই এগিয়ে যাবার পেছনে অন্যতম প্রধান শক্তি হচ্ছে তরুণ সমাজ। তরুণদের উজ্জীবিত করার মাধ্যমে ঈর্ষণীয় এই অগ্রগতির মূলমন্ত্র শিখিয়ে গেছেন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যুবকদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু মিশে আছেন, থাকবেন। বর্তমান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসিকতা, অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলি, প্রজ্ঞা আর দূরদর্শিতায় দীক্ষিত। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। এই এগিয়ে চলায় বাংলা ও বাঙালিকে উদ্দীপিত করছে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। আর নীরবে পাথেয় হয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন।

বঙ্গবন্ধু যে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বারবার বলে গিয়েছিলেন, আজ আমরা সেই মুক্তি অর্জনের পথে। বঙ্গবন্ধু প্রায় বক্তব্যে বলতেন, 'দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হলে বেকার সমস্যা এবং সম্ভাবনা দুটিই তরুণ সমাজের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। তরুণরা বেকার থাকলে তারা বিপদগ্রস্ত হয়, দেশের জন্য ক্ষতিকর বোঝায় পরিণত হয়। আর কোনো দেশের তরুণ সমাজ যদি কর্মঠ হয় এবং কাজের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পায়, তাহলে ওই দেশের দ্রুত উন্নতি কেউ আটকাতে পারে না। তরুণদের বুদ্ধি, মেধা এবং সতেজ জ্ঞানের গতি এই সবুজ-শ্যামল বাংলাকে প্রকৃত সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে পারে।'

তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে নতুন পরিচয়ে পরিচিত। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পথে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্য রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। পোশাক ও জনসংখ্যা রপ্তানিতে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে মডেল। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানব উন্নয়ন সূচকের ক্রম অগ্রগতি, গড় আয়ু বৃদ্ধি বাংলাদেশকে নতুন রূপে পরিচিতি দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আজ বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে।

১লা নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়। এ বছর 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০' শিরোনামে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দিবসটির এই নামকরণ। এবছর দিবসটির স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে– 'মুজিববর্ষের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান'। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

বাণীতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, 'বাংলাদেশের ইতিহাসে যুবদের বীরত্বপূর্ণ অবদান ও মহান আত্মত্যাগ চির অম্লান হয়ে থাকবে।'

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'যুবসমাজ জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। তারা সাহসী, বেগবান, প্রতিশ্রুতিশীল, সম্ভাবনাময় ও সৃজনশীল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে মুক্তিসংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এদেশের যুবসমাজ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য।'

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, 'বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ। আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তর ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন করতে এ জনমিতিক সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণীতে বলেন, 'যুবসমাজকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান, আত্মোন্নয়ন ও সমাজ বিনির্মাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আশা করি, প্রাণশক্তিতে ভরপুর আমাদের যুবসমাজ তাদের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরো কার্যকর অবদান রাখবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২ লাখ ২৯ হাজার ৭৩৭ জন শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৬৪টি জেলা কার্যালয় ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৪৯৮টি উপজেলায় ৮৩টি ট্রেডে এ পর্যন্ত ৬১ লাখ ৭৬ হাজার ৭০৮ জন যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।'

মহিলা, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিও যুবসমাজকে দায়িত্বশীল হয়ে সমাজ-রাষ্ট্র থেকে সন্ত্রাস, মাদক, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদ নির্মূলেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সারা দেশে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও জেলা-উপজেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন সংগঠন র‍্যালি, আলোচনাসভার আয়োজন করে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

অভিবাদন মুজিব শতবর্ষ

মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ

আবার আসিব আমি
যখন বাংলার বয়স দুশো বছরে
পা বাড়াবে– পূর্তি হবে ক্যালেন্ডারের পাতায়
খোদিত অক্ষরে
সহাস্য-কলবরে, আনন্দ-উল্লাসে
আবার আসিবে ফিরে নতুনের জয়গান
গাইব আমি
এখন যেমন গেয়ে চলেছে
বাংলার মানুষ মোহনবাঁশির সুরে সুর মিলিয়ে।
জীবন-জয়ের গান সুরে সুরে
বেলা-অবেলায় প্রতিদিন প্রত্যুষে
ভোরের আজানের মতো
জাগিবে কোলাহল শত বছর পর
বাংলার ঘরে ঘরে।
এমনি করে পরিবর্তন হবে একশ বছর পরে
আকাশ-বাতাস নৈসর্গিক লীলাভূমি
এ বাংলায়
যা আজ উদ্‌যাপিত হচ্ছে
নতুন কেতনে বাংলার বুকে
রঙিন স্বপ্নে ফুলঝুরি এঁকে।
ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে আনন্দ-উল্লাস
ধন্যে ধন্যে।
আবার উঠিব জেগে আলো আর আঁধারেতে
দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে
এ বাংলায় নব চেতনায়
নতুন রঙে রং রাঙিয়ে
আবার জেগে উঠিবে যুগ স্রষ্টার ভাষণ
লাখো মানুষের ঢল নামবে
উচ্চারিত হবে বজ্রকণ্ঠে।
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
উচ্চারিত হবে রেসকোর্স ময়দানে।

অন্যরকম দিন

অমিত রেজা

দিনের শুরুটা আনন্দের না বেদনার
কোথাও নেই সীমানার ঘের
চিকচিক বালিতে সাগরের কল্লোল
শিশির ভেজায় জ্যোৎস্নার শরীর
কখনো মনে হয়–
এই দিন আনন্দের
এই দিন বেদনারও।
আনন্দের নয়
বেদনারও নয়
এ এক অন্যরকম দিনের শুরু।

মুজিব মানে আঁধার ভাঙা গান

সোহরাব পাশা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
চেতনার বাতিঘর তিনি দীপ্ত সূর্যের সমান
নীল আকাশে লাল-সবুজের ওই পতাকা
বঙ্গবন্ধুর প্রাণের গহীন স্বপ্ন-আঁকা
এ মাটির যেখানেই ছোঁবে মুজিব উঠবে হেসে
অকাতরে দিয়েছেন প্রাণ এদেশকে ভালোবেসে
মুজিব মানে আঁধার ভেঙে জেগে ওঠা দৃপ্ত প্রাণ
মুজিব মানে বাংলাদেশ, স্বাধীনতার জয়গান
মুজিব মানে বাঙালির মুখ, বাঙালির সুখ
মুজিব মানে বাঁধনছেঁড়া ইস্পাত কঠিন বুক
মুজিব তুমি বাঙালির তুমি তো বাংলার
মৃত্যু নেই তোমার, ফিরে আসবে তুমি বারবার
হে মুজিব, মৃত্যু তোমাকে করেনি নিঃশেষ
তুমি আছো প্রাণে প্রাণে যতদিন আছে বাংলাদেশ।

মানচিত্রের কবি

সাঈদ তপু

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলজুড়ে
তোমার কবিতার খাতা
স্বপ্নের পাতায় পাতায় দ্যুতি ছড়িয়ে
গড়েছো ত্যাগের মহিমা
নান্দনিক শিল্পবৈচিত্র্যে বোধের কারুকাজ
এ এক কীর্তিময় বুননশৈলী
বীরাঙ্গনার চোখের অগ্নিজল
বীরের শোণিত কালির মিশ্রণে
দীর্ঘ ন'মাস ব্যাপ্তিকাল রচনা এটি
তাই এ মহাকাব্যটির জগৎখ্যাতি
শত সহস্র যুগের আকাঙ্ক্ষা বুকে
তুমি ধরায় এসেছিলে
মানচিত্রের কবি হয়ে
মাতৃরূপে দেখেছ যাকে
ছিঁড়েকুটে খায় তাকে নখদন্তদানব
দুঃস্বপ্নে কাটে তাঁর বিভাবরী
তাই মুক্তির বিভায় উন্মত্ত তুমি
ব্যস্ত কবিতা লেখায়
এ কোনো ভাষার কবিতা নয়,
নয় শব্দের পদ্যময় পঙ্‌ক্তি
শুধু চেতনার অলংকার, প্রেমের অহংকারে
তর্জনীর দ্যুতিময়তায় লোহিতের অক্ষরে লিপিবদ্ধ
বাংলাদেশ; এ এক অনবদ্য কবিতা
অসামান্য তুমি, হে মানচিত্রের রচয়িতা।

দেশের মাটি
মিয়াজান কবীর

সোনা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়
মাটি পুড়ে সোনা,
দেশের মাটি নিখাদ খাঁটি
রঙিন স্বপ্ন বোনা।
ধুলোমাটি গায়ে মেখে
করেছি যে খেলা,
এক্কা-দোক্কা খেলে খেলে
কাটছে সারা বেলা।
দেশের মাটি ভালোবাসি
সে তো প্রাণের অধিক,
এই মাটি যে করে হেলা
তাহারে জানাই ধিক্।
জীবন দিতে করেছি পণ
দেশের মাটির জন্য,
দেশের মাটি ভালোবেসে
হবো আমি ধন্য।

বিজয়ের মানচিত্র
সুজিত হালদার

অবশেষে তোমাকে পেয়েছি
দীর্ঘ ন'মাস পথ-পরিক্রমা শেষে
পৃথিবীর ইতিহাসে তুমিই একমাত্র প্রসূতি মাতা
বারবার বুকের তাজা রক্তে সিক্ত হয়েছ মুক্ত হতে।
বর্ষার থোকা থোকা মেঘগুলো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে
অবাধ স্বাধীনতায় ঝরে যায় শ্রাবণের ধারা
বাতাসে তার তাজা বুলেটের করুণ রক্তঘ্রাণ
শব্দ ঝঙ্কারে ঝরেছে বুকের শোণিতধারা।
বিবস্ত্র বোনের আর্তনাদ আর লাঞ্ছিত মায়ের হাহাকার
ভারী হওয়া নিশ্বাসে বারুদের গন্ধ বীভৎস আহাজারি
কবরে কবরে বাঙ্কারে বাঙ্কারে লাশেদের মিছিল
রাইফেলের বাটে বাটে মজবুত হয় গৌরবের শিরদাঁড়া।
এ যুদ্ধ আজ সাদা মানুষের সাদা মেঘের পালক
পাড়া-মহল্লায়-শহরে-গ্রামে একই স্লোগান জয়ের নেশা
চাঁদের মতো রাত ব্যথার স্পর্শ ছড়ায়ে হাঁটতে থাকে
নয়নে নয়নে অশ্রু বিভীষিকাময় জীবনের ইতিকথা।
মুক্তির নায়ক হেসে শোনালো মুক্তির জয়গাথা
লিখে দিল মুক্তির চিরকুট স্বাধীনতার শ্বেতপত্র
বেদনার পুঞ্জীভূত ছোপ ছোপ রক্তে ব্যথার অনুরাগে
অবশেষে আঁকা হলো দেশের কাঙ্ক্ষিত মানচিত্র।

দেশ
রোকসানা গুলশান

এখানেই ফুটবে ফুল
প্রফুল্ল সুবাস।
হৃদয় পরশে আকুল এ মাটি আজ।
এখানেই রেখ জল
যতই বেদনার্ত।
উঠবে হেসে দেখ সে, বিজয়ের সাজ।
এখানেই খুঁজো সজীবতার
ম্যানগ্রোভ নোনা ঘ্রাণ।
ভালোবেসে প্রকৃতি ও জীবনের কাজ।
এখানেই বলো কথা
অভিযোগ, অভিমান।
মধুদিন এনে মৌমাছি, ছড়াবে সে আওয়াজ।
এভাবেই রেখ বিশ্বাস
রেখ শক্ত শেকড়।
তোমার তুমিকে চিনে নিয়ো, হয়ে হৃদয়ে মহারাজ।

যাও যে অচিনপুরে
গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

ও করোনা, ও করোনা
এত নিষ্ঠুর কেন?
লক্ষ প্রাণ কেড়ে নিয়েও
সাধ মিটেনি যেন।
তোমার দিলে নেই কি মায়া
নেই কি দয়া আর
উলট-পালট করে দিলে
বিশ্বের চারিধার।
মানুষ মেরে কী লাভ তোমার?
দয়া করে বলো
এমন কাণ্ড করছ তুমি
করছ হুলুস্থুল।
আর করো না এমন তুমি
যাও চলে যাও দূরে
এই পৃথিবী নয় তো তোমার
যাও যে অচিনপুরে।

মনে রেখো
আবুল কালাম আজাদ

যে তোমাকে দিল একবিন্দু আলো
অথবা একটি শিশির কণা
তার প্রতিদানও মনে রেখ।
এক পৃথিবী সমান আঁধারের চেয়ে
একবিন্দু আলো অনেক বেশি দামি
মহাসিন্ধু সৃষ্টিতেও একবিন্দু জলকণার
অবদান থাকে।

সরকারের এইডস কর্মসূচি ও চলমান কার্যক্রম

মারিয়ম ফারিহা

বিশ্ব এইডস দিবস ১লা ডিসেম্বর। প্রতিবারের মতো এবারো স্বাস্থ্যবিধি মেনে সারা দেশে দিবসটি পালন করা হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'সারা বিশ্বের ঐক্য, এইডস প্রতিরোধে সবাই নেব দায়িত্ব'। বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশ সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার ০.০১%-এর নিচে এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি'র মাত্রা এখনো নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি রোগী শনাক্ত হয় ১৯৮৯ সালে, সেই থেকে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৭৩৭৪ জন আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ১২৪২ জন মারা গেছে, দেশে সম্ভাব্য এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ১৪০০০।

সরকারের চলমান কার্যক্রম

১. প্রতিরোধ কর্মসূচি: বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস রোগী শনাক্তকৃত হওয়ার শুরু থেকেই নানামুখী প্রতিরোধ কর্মসূচি এবং চিকিৎসাজনিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের ২৩টি জেলায় মোট ২৮টি হাসপাতালে এইচআইভি টেস্টিং অব্যাহত রেখেছে। অভিবাসীপ্রবণ এলাকাগুলোতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের এইচআইভি/এইডস বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। প্রবাসীগণ বিভিন্ন দেশে যাওয়ার আগে এই সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে এইচআইভি বিষয়ক ধারাবাহিক নাটক, টিভিসি সম্প্রচারসহ নানাবিধ প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি)-এর অর্থায়নে জাতীয় এইডস/এসটিভি প্রোগ্রাম দেশের ১০টি যৌনপল্লিতে মোট ৩৬০০ জন নারী যৌনকর্মীকে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক প্রতিরোধ সেবা প্রদান করছে। সম্প্রতি সরকারি অর্থায়নে আরো ১০০০০ শিরায় মাদকগ্রহণকারী ও ৫০০০ পুরুষ যৌনকর্মী/হিজড়াকে এইচআইভি সেবার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১৭০০ জন শিরায় মাদকগ্রহণকারী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় সুঁই সিরিঞ্জ কর্মসূচি থেকে Oral Substitution Therapy (মেথাডন প্রোগ্রাম) কর্মসূচিতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

২. আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা: এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে, ১লা অক্টোবর ২০১৭ থেকে দেশের ৬টি সরকারি হাসপাতালে এন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) সেন্টার চালু করা হয়। ২০২০ সাল নগদ মোট ১১টি সরকারি হাসপতাল থেকে এই চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা শিরায় মাদক নেয় তাদের জন্য ঢাকা শহরে কয়েকটি ড্রপ ইন সেন্টারের মাধ্যমেও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ৪৪২০ জন এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছে। যারা চিকিৎসা সেবার আওতায় আছে তাদের ক্ষেত্রে এন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি ঠিকমতো কাজ করছে কি না, ভাইরাসের মাত্রা কমল কি না, এক কথায় মনিটরিং এবং ফলোআপের জন্য জিন এক্সপার্ট মেশিনের মাধ্যমে এআরটি সেন্টারের ভাইরাল লোড পরীক্ষা করা হচ্ছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ৮৬% রোগীর ভাইরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কোভিড-১৯-এর প্রকোপের দরুণ দেশব্যাপী লকডাউন পরিস্থিতিতে এআরটি সেন্টারগুলো থেকে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে ঔষধ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেবাদানকারীদের পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যথা– মাস্ক, গ্লাভস, গগলস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, গাউন সরবরাহ করা হয়েছে। মা হতে শিশুতে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে বাংলাদেশ একটি অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে দেশের ১৩টি সরকারি হাসপাতালে 'মা হতে শিশুতে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ' কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

৩. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: এইচআইভি শুধুমাত্র স্বাস্থ্যগত সমস্যা নয়– এই বিবেচনায় জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপন করেছে। যেমন– স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশেষত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ট্রেনিং, বোয়েসল, গামকা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিকুলাম বোর্ড, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কারা অধিদপ্তর ইত্যাদি। এছাড়া এইচআইভি শনাক্তকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের সাথে সমন্বয় সাধন করছে এবং সেবাদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

৪. স্ট্র্যাটেজিক ইনফরমেশন ও গাইডলাইন উন্নয়ন: চলতি বছরে আইইডিসিআর-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী এসটিআই সার্ভিলেন্স পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এইচআইভি সার্ভিলেন্স পরিচালনা করছে, শীঘ্রই এর ফলাফল সকলকে অবহিত করা হবে। এছাড়া এইচআইভি কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের তথ্যাবলি প্রতি তিন মাস অন্তর ডিএইচআইএস-২ তে আপলোড করা হচ্ছে, এ মুহূর্তে ১৩১টি সেন্টার থেকে প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন

মো. এনামুল হক

'জনগণের মতামত ব্যবহার না করে শুধু আইন দিয়ে দুর্নীতি দমন করা যাবে না। তাই সকলকে অবশ্যই সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে'– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি দুর্নীতি দমনে কতটা সোচ্চার ছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে দুর্নীতি ইস্যুটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রত্যেকটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিচিতি পেয়েছে। দুর্নীতি যে-কোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। জাতিসংঘ ২০০৩ সালে ৯ই ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। দুর্নীতি দমন কমিশন ২০০৭ সাল থেকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন শুরু করে। দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিবছর দিবসটি পালন করলেও দেশে সরকারিভাবে দিবসটি পালিত হতো না। এ প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন কমিশন ৯ই ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালনের অনুরোধ জানিয়ে ২০১৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র প্রেরণ করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের ১৮ই জুলাই সরকার ৯ই ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস' ঘোষণা করে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনি ইশতাহার প্রকাশ করেছিল, তা নানা কারণেই ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা ছিল অভূতপূর্ব। কারণ আমাদের দেশে যুগের পর যুগ দুর্নীতি চলে এলেও দুর্নীতিকে রাজনৈতিক ও নির্বাচনি এজেন্ডায় পরিণত করার নজির কম। বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের অঙ্গীকার করেছে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের কারণ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাষ্ট্র নিরপেক্ষভাবে অপরাধীদের জন্য উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাসীরা আইনের মুখোমুখি হচ্ছে এবং আদালত কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি পাচ্ছে। মানি লন্ডারিং ও অর্থায়নের সাথে জড়িতদের আইনের মুখোমুখি করে বিচার করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে, শাস্তির ভয়ে নতুন করে ঝোঁক বেঁধে আসা কেউই সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মতো ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে না এবং সন্ত্রাসবাদের জন্য উদ্ভূত বেশ কিছু কারণকে নানাভাবে প্রতিকার ও প্রতিরোধের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে সন্ত্রাসবাদে নিরুৎসাহী করে তুলেছে সরকার।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের যে ঐকান্তিক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের যে অবস্থান তা যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়। তবে সন্ত্রাসবাদের মতো কেউই আর দুর্নীতি করতে সাহস পাবে না কিংবা কেউই অনুপ্রেরণা তথা মদদ জোগাবে না। কাজেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণু নীতি প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রকেন্দ্রিক তত্ত্ব জোরালোভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য। বর্তমান সরকার দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। দুর্নীতি দমনে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং আইন প্রয়োগ ও নিয়মিত অভিযান চলমান রয়েছে এবং বেশ কিছু অভিযান ফলপ্রসূ হয়েছে। ইতোমধ্যে, সরকারের কার্যকরী তৎপরতা থেকে সমাজের রেহাই পাচ্ছে না। অনেকের বিরুদ্ধেই দুর্নীতি দমন কমিশন চার্জশিট তৈরি করেছে এবং শাস্তির আওতায় নিয়ে এসেছে। কেননা দুর্নীতিবাজ কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়।

যে-কোনো দেশের জাতীয় সমস্যা দুর্নীতি প্রতিরোধ করা। শুধু দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দিয়ে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা, দেশপ্রেম এবং তারুণ্যের অঙ্গীকার। তরুণ ও যুবকদেরই দুর্নীতি প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব। তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের প্রত্যয়, দর্শন, প্রত্যাশা ও অঙ্গীকারের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে দুর্নীতির মাত্রা এবং কারণ নিয়ে দ্বিমত থাকলেও এর প্রতিরোধের বিষয়ে কারো কোনো ভিন্নমত থাকার কথা নয়। এছাড়া সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল দেশ গড়ার আন্দোলনে অংশ নিতে হবে। যুবসমাজই দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার ক্ষেত্রে উদ্দীপনামূলক ভূমিকা নিতে পারে। দেশের যুবসমাজ অসততা, অন্যায় ও দুর্নীতির বিরোধিতা শুরু করলে দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা দুর্নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এর জন্য প্রয়োজন তরুণ ও যুবকদের সম্মিলিত ঐক্যমত ও সংঘবদ্ধতা। নাগরিকরা এমন একটি সামাজিক পরিবেশ চায়, যেখানে তারা সবাই মিলে পরিবার-পরিজন নিয়ে নিরাপদে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। যেখানে দুর্নীতি হবে, সেখানেই শান্তিপূর্ণভাবে জোরালো প্রতিবাদ জানাতে হবে।

ধর্মীয় বিধিবিধান ও নৈতিক অনুশাসনের কথা জনসাধারণের কাছে

সুন্দরভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব। দুর্নীতি প্রতিরোধে নিজের ইচ্ছাশক্তি ও আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন। মানুষের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিবেকবোধের মাধ্যমে সমাজে দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করতে হবে। প্রতিরোধের মাধ্যমেই দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে। দুর্নীতি দমনের জন্য সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। এজন্য ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি বিষয়ক সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব ও বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয় প্রভৃতি স্থান থেকে সদুপদেশ ও ধর্মীয় বিধিবিধানের আলোকে তৃণমূল পর্যায় থেকে দুর্নীতি দমনের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তৈরি করে সামাজিক আন্দোলন ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে আন্তঃধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ততা ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই আসুন, দুর্নীতিকে 'না' বলার প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গীকার সামনে রেখে সর্বাত্মক নৈতিকতা চর্চার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি। সকলের সমন্বিত উদ্যোগই কার্যকরী সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

বিদ্যুতায়নে সরকারের সাফল্য

রূপায়ণ বিশ্বাস

বিশ্বায়নের যুগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি যে-কোনো দেশের সার্বিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার একটি অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন সক্ষমতা নির্ভর করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সুষ্ঠু বিনিয়োগ বা ব্যবহারে। টেকসই উন্নয়নের ১৭টি অভীষ্টসমূহের মধ্যে সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি অন্যতম। যেখানে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সকলকে আধুনিক, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া; জ্বালানি বা বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সর্বনিম্ন রাখা, বৈশ্বিক মিশ্র জ্বালানিতে ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ পর্যাপ্ত হারে বাড়ানোসহ বিশ্বজুড়ে জ্বালানি দক্ষতা বাড়ানো, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন বিদ্যুৎ বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১১ বছরে ১২৮টি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৩ হাজার ৫৪৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত ৪৭ শতাংশ থেকে ৯৭ শতাংশ হয়েছে। সঞ্চালন লাইন ১২ হাজার ২৮৩ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৫ লাখ ৭৭ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সংস্থাওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, নিয়মিত তদারকির ফলে সিস্টেম লস উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বিতরণ সিস্টেম লস ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৯.৩৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৮.১৯%-এ নেমে এসেছে। টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে সারা দেশে ৫৮ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম ও ২৬টি মিনি গ্রিড স্থাপনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অফগ্রিড এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

বিল্ডিংয়ের ছাদকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নেট মিটারিং গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে গ্রিড-অফগ্রিড নির্বিশেষে সকল গ্রাহকের জন্য ইউনিফর্ম ট্যারিফের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে অফগ্রিড এলাকায় গ্রাহকের আর অতিরিক্ত হারে ট্যারিফ প্রদান করতে হবে না।

বিদ্যুৎ খাতে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ মাত্র ২ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৭ হাজার ৬৩৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিববর্ষকে 'সেবা বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে মুজিববর্ষের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' বাস্তবায়ন করছে। সরকারের ভিশন– ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০০০০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০০০০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া পায়রা, রামপাল, মাতারবাড়ি ও মহেশখালীতে কয়লাভিত্তিক প্রায় ১০ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮টি মেগা প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের পথে। ১২ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে পাবনার রূপপুরে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ২০২৩ সাল নাগাদ রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে ১২০০ মেগাওয়াট এবং ২০২৪ সালে আরো ১২০০ মেগাওয়াটসহ মোট ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে কেন্দ্র করে প্রণীত হয়েছে আইন ও নীতিমালা। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য 'সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা) আইন ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রযুক্তির উদ্ভাবনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১৫' করা হয়েছে। বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) গঠনসহ 'বিদ্যুৎ আইন ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয়ের দিকে গুরুত্ব প্রদান করে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্যাস সংকট মোকাবিলায় এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া পেপারলেস অনলাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন ও নিয়োগ ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাপনা চালুকরণ ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। তাই সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বিজয়ের প্রত্যয়
রুহুল গনি জ্যোতি

উষর মরুতে অশ্রু ঝরিয়ে বৃথা কেটে যাবে দিন
এমন ভাবনা ভাবি না কখনো হৃদয় শঙ্কাহীন
আলোহীন পথ আঁধারে যতই ঢেকে দিক বার বার
এখনো দু'চোখে স্বপ্ন রয়েছে আলো কেড়ে আনবার
আগামী দিনের সূর্যটা তাই বুকের গভীরে নাচে
যতই আসুক বিঘ্ন বিপদ আশা তবু জেগে আছে
জেগে উঠবোই মাথা তুলবোই রুখবে আমাকে কে?
লাখো শহিদের ত্যাগের চেতনা রক্তে যে রয়েছে
সেই চেতনায় এগিয়ে চলি, সেই চেতনায় বাঁচি
সেই চেতনার দৃপ্ত শপথে জয়ে-আনন্দে নাচি।

জয় বাংলায় আগামীর গান
খান চমন-ই-এলাহি

'মায়ের কাছে যাব'–
বাঁচার আকুতি তখন মুজিবের শিশুপুত্র রাসেলের
যখন তার বয়স মাত্র দশ বছর নয় মাস সাতাশ দিন
আর পড়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুলে
ফুলকলিদের বন্ধু হয়ে ক্লাস ফোরে।
মানুষের মৃত্যু প্রশ্নবিদ্ধ হলে
মানুষ হেরে যায়
চিরকালীন লাঞ্ছনা নামে সমাজদেহে
মানুষের ঘরে ঘরে।
আবেগ উষ্ণতা হারায়
ভালোবাসা লুণ্ঠিত হয়
বিপরীতে ঘৃণা বিদ্বেষ বাড়ে অহরহ।
মানুষের সুস্থতার মতো
নদীর বহতার মতো
বিহঙ্গের উড়ার মতো
আদর্শ জনপদ কাম্য সবার
অথচ নিমিষে লুণ্ঠিত মানবতা
জীবনের জয়গান-স্বাধীনতা!
বাঙালি বীরের জাতি
কোনো অনিয়ম মানে না কখনো।

বিজয় মনের সুর
বশিরুজ্জামান বশির

লক্ষ শহিদ প্রাণ দিয়েছে
বিজয় পাবার জন্য
শত্রুমুক্ত বিজয় পেয়ে
হলাম আমরা ধন্য।
লাল-সবুজে বিজয় আসে
মায়ের মুখে বুলি
বিজয় দিয়েছে বঙ্গবন্ধু
জাতির কাছে তুলি।
বিজয় এলে ভয় থাকে না
বিজয় মনের সুর
বিজয় নিয়ে বীরের জাতি
যাবে অনেক দূর।

ডিসেম্বরের প্রণতি
মোহাম্মদ ইলইয়াছ

তোমাকে ভালোবাসি বলে
সূর্যোদয়ের ছবি আঁকছি মানচিত্রে
তোমাকে ভালোবাসি বলে
আকাশে উড়িয়েছি শ্বেত কপোত।
তোমাকে ভালোবাসি বলে
গেয়েছি রবি-নজরুলের স্বদেশি গান
তোমাকে ভালোবাসি বলে
হোমশিখা জ্বালিয়েছি আঁধার ঘরে।
তোমাকে ভালোবাসি বলে
প্রাণ দিয়েছি দহনদানে
তোমাকে ভালোবাসি বলে
স্বরাজে লিখেছি হারানো গৌরবের কথা।
তোমাকে ভালোবাসি বলে
এখনো বেঁচে আছি নরম মাটিতে
তোমাকে ভালোবাসি বলে
আমরা মেতে উঠলাম আনন্দ-উল্লাসে।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ
মো. আসাদুজ্জামান সরকার

শোষিত থেকে উৎসাহ
উৎসাহ থেকে সাহস,
নিপীড়িত থেকে তাড়ন
তাড়ন দিয়েছে বিজয় বেশ।
বদ্বীপ থেকে বঙ্গ
বঙ্গ থেকে বঙ্গবন্ধু,
বাংলা থেকে বাঙালি
বাঙালি পেয়েছে বাংলাদেশ।
বৈদ্যনাথতলা থেকে মুজিবনগর
মুজিবনগর থেকে শপথ,
পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা
স্বাধীনতা এসেছে মুক্তি সংগ্রামে।
বাংলাদেশ থেকে বিশ্বদরবার
বিশ্বদরবার থেকে প্রজন্মজুড়ে,
শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু
বঙ্গবন্ধু থাকবে চিরস্মরণে।

ভালোবাসা-ভালোবাসা
শাহনাজ

ভালোবাসি আমি ঐ নীলাকাশকে
সমুদ্রের অথৈই জল, দিঘির বুকে
রবির ঝিলিমিলি। বন্ধুর গিরিপথ
পেরোতে চন্দ্রাবতী উঁকি দিয়ে যায়
আঁকাবাঁকা পাথুরে মেঝেতে ঝরাপাতা
বকুলের কুড়ি মাড়িয়ে দুপায়ে
কে যায় অনন্তের ঐ আলপথ বেয়ে।

যুদ্ধযাত্রা

রফিকুর রশীদ

সেদিন ছিল শুক্রবার।

অন্যান্য দিনের মতোই প্রভাত পাখির কাকলিতে সূচনা হয় এই দিনের। মুয়াজ্জিনের সুরেলা কণ্ঠের আজান ভোরের বাতাস চিরে ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর, ঘোষণা করে নতুন দিনের আগমন বার্তা। সূর্যের হাসিতে কেটে যায় কুয়াশা ঢাকা ভোরের বিষণ্নতা। নবীগঞ্জ জেগে ওঠে দশ দিগেরের আর দশটা গ্রামের মতোই। জেগে ওঠে আব্দুল জলিল ফারাজি। এই তার অভ্যাস। ফজরের আজান পড়তে না পড়তেই আপনা আপনি ঘুম ভেঙে যায়। কী শীত কী গ্রীষ্মে, তখন তার শয্যাকণ্টকিত হয়। চোখ রগড়ে বিছানা ত্যাগ করে। প্রাতক্রিয়া শেষে কুয়োতলায় বসে অজু বানায়। পাঁচিলের ওপাশে ছোটো চাচা আব্দুল জব্বার ফারাজির গলা খ্যাকারি শোনা যায়। অতঃপর মসজিদে গিয়ে দেখা হয় ছোটো চাচার সঙ্গে। তিনি বসেন ইমাম সাহেবের ঠিক পেছনে। মসজিদে এলে ঐটিই তার নির্ধারিত জায়গা। নড়চড় হবার জো নেই, সবাই তা জানে।

কিন্তু সেই শুক্রবার সকালে ফজরের নামাজে আব্দুল জব্বার ফারাজিকে তার নির্দিষ্ট আসনে দেখা যায়নি।

কিছুদিন আগেও তার এই আকস্মিক অনুপস্থিতি নিয়ে কেউ বিশেষ একটা চিন্তা বা দুশ্চিন্তা করেনি, এখন করে। মুরুব্বি মানুষ, বয়স হয়েছে, প্রতিদিন যথাসময়ে মসজিদে হাজির হতে পারেন না শারীরিক কারণেই– সবাই এই রকমই মনে করত। কিন্তু সম্প্রতি দেশের অবস্থা উত্তপ্ত হয়ে ওঠার পর তার শরীরে কোত্থেকে যেন হারানো শক্তি ফিরে আসে, সর্পিল ভঙ্গিমার বাঁকা লাঠিতে ভর দিয়ে মহকুমা শহরে চলে যান, মিটিং-মজলিস সেরে সন্ধ্যার আগে আগে বাড়ি ফিরে আসেন। কোনো কোনোদিন আবার ফেরাও হয় না তার। সেইদিন নবীগঞ্জের সবার দুশ্চিন্তা হয়। ভেতরে ভেতরে দুর্বোধ্য এক আশঙ্কা ছোবলায় আব্দুল জলিলের অন্তরে। ইতোমধ্যে এক জুম্মার নামাজের পর মসজিদে বসেই আব্দুল জব্বার ফারাজি সদর্পে ঘোষণা করেছেন– তিনি শান্তি কমিটির মেম্বার হয়েছেন, থানা এবং মহকুমা কমিটি দু জায়গাতেই তার নাম আছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নাকি সবাইকেই এরকম দায়িত্ব নিতে হবে। গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে এই নবীগঞ্জেও শান্তি কমিটি তৈরি করার পরামর্শ দিলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত মুসল্লিরা মিলে তাকেই চেয়ারম্যান করে তেত্রিশ সদস্যের গ্রাম কমিটি গঠন করে ফেলে। জব্বার ফারাজির পরামর্শ মানে যে সেটা আদেশ, এটা তখন সবাই বুঝলেও সে আদেশ মানতে চায়নি তারই ভাইপো আব্দুল জলিল ফারাজি। শান্তি কমিটি গঠনের সোচ্চার বিরোধিতা সে করেনি বটে, কিন্তু ঐ কমিটির তেত্রিশ নম্বর সদস্য হিসেবে তার নাম উত্থাপিত হলে সে কোনো সম্মতি না জানিয়ে ঘাড় গোঁজ করে মসজিদের বারান্দা থেকে উঠে চলে এসেছে। চারপাশের সবাই ক্যাটকেটে চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছে সেই চলে যাওয়া। তারপর দু'একজন ঘাড় ঘুরিয়ে জব্বার ফারাজির মুখের দিকে তাকালে সহসা তিনি পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে আনেন।

– আহা! থাক না জলিলের নামটা বাদই থাক। আমার নাম থাকা মানে তো ওর নামও থাকা। ওর বদলে দক্ষিণপাড়ার বদরুদ্দির নামটা লিখে নাও, একটা মেম্বার বাড়ুক।

উপস্থিত মজলিশ তাই মেনে নিয়েছে। বদরুদ্দির অনুপস্থিতিতেই তার নাম তেত্রিশ নম্বরে যুক্ত হয়েছে। মজলিশের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করার মানুষ বদরুদ্দিন নয়– এ আস্থা সবার আছে। জব্বার ফারাজি সেদিন মসজিদ থেকে বেরিয়ে তার বাঁকা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে নিজের বাড়িতে না ঢুকে পাশের দরজা দিয়ে ভাইপো আব্দুল জলিল ফারাজির বাড়িতে ঢুকে পড়েন। সামনে পড়ে জমিলা। সে চমকে যায়,
– দাদা, আপনি!

এমন ঘটনা সত্যি বিরল। পাশাপাশি বাড়ি হলেও শরিকানা জমি-জমা নিয়ে বিরোধের সূত্রে প্রায় বছর দশেক এ বাড়িতে তার পা পড়েনি। এমনিতে বাইরে থেকে এতটা ফাটল বোঝার উপায় নেই। চাচা-ভাইপো দুজনেই সে ফাটল ঢাকার বিষয়ে তৎপর। এতদিন পর ছোটোদাদাকে নিজেদের বাড়িতে দেখে জমিলার বিস্মিত হবারই কথা। সে খুশিতে আটখানা হয়ে মাকে ডেকে ওঠে,
– মা, আ মা...

জব্বার ফারাজি বাধা দেন
– মাকে ডাকতে হবে না, তোর বাপকে ডাক।
– আপনি ঘরে উঠে বসেন, আমি ডাকছি।

চড়ুই পাখির মতো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ নাচতে থাকে জমিলা। নাচবারই বয়স তার। পটলডাঙ্গা হাইস্কুলে ক্লাস টেনে পড়ে। জব্বার ফারাজির নাতনি, তবু এত কাছ থেকে কতদিন যেন দেখা হয়নি তার। ও বাড়িতেও যায় যখন তখন, চোখে পড়েছে বটে, কিন্তু এমন চড়ুই চড়ুই স্বভাবটা যেন নজরে পড়েনি কখনো। মন্ত্রমুগ্ধের মতো জমিলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আব্দুল জব্বার ফারাজির পেছন দিক থেকে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় জলিল ফারাজি। তখনো মাথায় টুপি। মসজিদ থেকে বেরিয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু বাড়ি ফিরছে এতক্ষণে। কোথায় গিয়ে যে দল পাকাচ্ছিল কে জানে! এ বাড়িতে ছোটোচাচাকে দেখে সেও খানিক বিস্মিত হয়; তবু নিজেকে সামলে নিয়ে আহ্বান জানায়,

– এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে এসে বসেন। জমিলা...

– না, না, ঘরে আর বসবো কী করে! মজলিশের মধ্যে তুমি যেভাবে অপমান করলে তাতে তো পরিচয় রক্ষা করাই কঠিন কাজ। এভাবে উঠে না এলেও পারতে!

– মসজিদ হচ্ছে ধর্ম-কর্মের জায়গা, রাজনীতির জায়গা নয়। কিন্তু সে যা-ই হোক, আমি তো আপনাকে অপমান করিনি ছোটোচাচা!

– না, অপমান করনি, জুতো মেরেছ।

– এ কী বলছেন আপনি!

– আমার নামে একটা কমিটি হচ্ছে, সেখানে তোমার নামটা থাকলে কী ক্ষতি হতো?'

– আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন ছোটোচাচা। মসজিদে বসেই সব রাজনৈতিক কমিটি হবে কেন? আর তাছাড়া কে কোন কমিটিতে থাকবে না থাকবে সেটা তার নিজের ব্যাপার হওয়াই উচিত।

– তা বটে। ঘরের মধ্যে মুক্তির চ্যালা বসিয়ে রাখলে ঐ রকম বুদ্ধিই আসে। তা তুমিও কি মুক্তি হয়ে গেছ?

– এসব আপনি কী বলছেন ছোটোচাচা! শান্তি কমিটির মেম্বার না হলেই মুক্তি হয়ে যায় নাকি?

– কেন তোমার শালা সাইফুল আসেনি রাইফেল নিয়ে? সে মুক্তি হয়নি? খবর কিছুই চাপা থাকে না আব্দুল জলিল।

আব্দুল জলিলের চক্ষু চড়কগাছ। তলে তলে এসব কী অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে তার ছোটোচাচা! এ কোন জাল ছড়িয়ে চলেছে! সপ্তাহখানেক আগে সাইফুল এসেছিল বটে, সে চলেও গেছে গত পরশু। কিন্তু তার কাঁধে আবার রাইফেল দেখল কে! শহরে থেকে সে কলেজে পড়ে। তার পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ওদের গোটা পরিবারই পাকিস্তানপন্থি, তারমধ্যে সাইফুল একটু বেয়াড়া বটে, মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে এসে কলেজে ভর্তি হয়েছে, তাই বলে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে– এমন তো কই শোনেনি সে! অথচ সেটাই নজরে পড়ল জব্বার ফারাজির।

– শোনো আব্দুল জলিল, ছোটোচাচা বলেন, আমাদের ফারাজি ফ্যামিলির একটা ইসলামি ঐতিহ্য আছে। আমরা পাকিস্তান ভাঙার আন্দোলনে নামতে পারি না।

– আমি সেই আন্দোলনে নেমেছি আপনার এ ধারণা হলো কী করে ছোটোচাচা?

– ধারণার কথা নয়, এটা বাস্তবে দেখার বিষয়। তোমার ভালো তোমাকেই দেখতে হবে, সামনে বিপদ-আপদ এলে সেটাও তোমাকেই দেখতে হবে, এটুকু মনে রেখ।

এরপর আর আব্দুল জব্বার ফারাজি ভাইপোর বাড়িতে একদণ্ডও দাঁড়াননি। পেছন থেকে জমিলা ডেকে ওঠে– দাদা, ভাত খেয়ে যান, কিন্তু তিনি দাঁড়াননি। এমনকি জমিলার চড়ুই চড়ুই চেহারার দিকেও তাকাননি। সোজা এক টানে বেরিয়ে গেছেন।

আব্দুল জলিল আপন চাচার এ হুমকি নীরবে হজম করেছে। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলেনি। তবে ভেতরে ভেতরে দুর্বোধ্য এক আশঙ্কা কাজ করেছে– আঘাতটা কোন দিক থেকে আসে তাই দেখার জন্যে। সেই সম্ভাব্য আঘাত প্রতিরোধের উপায় খুঁজে খুঁজে হদ্দ হয়েছে, কিনারা ঠাহর করতে পারেনি। প্রায় প্রতি ওয়াক্তে মসজিদে নামাজ পড়তে যায়, পেছনের সারিতে বসলেও ছোটোচাচা আব্দুল জব্বার ফারাজির ওপর নজর রাখে। শুক্রবার সকালে ফজরের নামাজে তাকে না দেখে চমকে ওঠে, তবে কি গত রাত্রে বাড়ি ফেরেনি! না, গতকাল সারাদিনই তাকে দেখা যায়নি মসজিদে। দেখা গেল জুম্মার নামাজে। আজান পড়ার সাথে সাথে সবার আগে মসজিদে হাজির। জায়নামাজ বিছিয়ে নীরবে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন। যেনবা বাহ্যজ্ঞানশূন্য। কিন্তু আধা ঘণ্টাখানেক পরে নামাজ শুরু হলে দেখা গেল তিনি জাগতিক চেতনাতেই আছেন, নামাজের জন্যে পালনীয় রীতি-কর্তব্যে ঠিকমতোই সাড়া দিয়ে যাচ্ছেন। এভাবেই হয়ত যথাসময়ে নামাজ শেষ হতো, যে যার মতো বাড়ি যেত, সব কিছু যথানিয়মে চলত। কিন্তু সেদিনই প্রথম নবীগঞ্জে মিলিটারি ঢুকল বীরবিক্রমে সেই বেলা দ্বিপ্রহরে। মসজিদে নামাজ তখনো শেষ হয়নি। বাইরে গ্রাম্যরাস্তায় মিলিটারি ট্রাকের গর্জনে নামাজের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। মসজিদের বারান্দা থেকে লাফিয়ে বেশ কজন মুসল্লি পালাতে যায়। তখনি গুলির শব্দ ছুটে আসে ঠা ঠা...ঠা ঠা...। আব্দুল জব্বার ফারাজি আকুল কণ্ঠে নছিহত করেন– 'অই মিয়ারা, খোদার ওপর তোয়াক্কাল রাখো। বালা মুছিবত কেটে যাবে।'

এ পরামর্শ মাঠে মারা যায়। তবু এই নছিহতের ওপর ভরসা করে মুসল্লিরা বসে থাকে না। গ্রামে মিলিটারি আসা মানে যে কী ধরনের বালা মুছিবত, তা অনেকেই ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছে আশপাশের গ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে। কাজেই নামাজ অসমাপ্ত রেখেই অনেকে পথে নেমে পড়ে। মল্লিকপাড়ায় আগুন জ্বলছে, বাতাস বয়ে আনে সেই হলকা। বাঁশের ঝাড় পুড়ছে ফটফট শব্দে। নারী-পুরুষের আহাজারির শব্দ গুলিবিদ্ধ হচ্ছে মুহুর্মুহু। মসজিদ প্রায় ফাঁকা তখন। জলিল ফারাজি পেছনের সারি থেকে এগিয়ে আসে সামনে, তার ছোটোচাচার কাছাকাছি। জব্বার ফারাজির দু'চোখ তখন বিস্ফোরিত প্রায়, যেনবা পাছা ঘেঁষটে দু'হাত পিছিয়েও যান। একেবারে মুখোমুখি এসে আব্দুল জলিল আঙুল উঁচিয়ে ঘোষণা করে,

– আমার বাড়িঘর, পরিবার-পরিজনের কিছু হলে আমি আপনাকে দেখে নেব ছোটোচাচা। এই মসজিদে দাঁড়িয়ে বলছি, আপনাকে আমি ছাড়ব না।

তখন অকস্মাৎ জব্বার ফারাজির চোখমুখ ভাবলেশহীন হয়ে পড়ে, ভয়-ভীতি, শাস্তি-পুরস্কার কিছুই সেখানে ছায়া ফেলে না। আব্দুল জলিল ধীর পায়ে মসজিদ থেকে নেমে আসে। ততক্ষণে নবীগঞ্জের তাণ্ডবলীলা শেষ হয়েছে। পড়ে আছে ধ্বংসাবশেষ। মসজিদ থেকে গজ দশেক তফাতে পড়ে আছে রহিম মোল্লার মৃতদেহ, রক্তে ভেজা তার সাদা পাঞ্জাবি, মাথার টুপি খসে পড়েছে মাথার পাশে। আর একটু এগোতেই চোখে পড়ে পুব আকাশে ধোঁয়ার রেখা। জলিল ফারাজির বুকের মধ্যে ছ্যাঁক করে ওঠে– ওটা যে তাদের পাড়া!

পুব পাড়ায় ঢুকতেই প্রথমে পড়ে মোল্লাবাড়ি। ওরা বিশ ঘর মানুষ গুছিয়ে এক ভিটেয় বাস করে। কিন্তু এ কী হাল ওদের বাড়িঘরের! আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে ঘরের পর ঘর। দগ্ধ খুঁটি নির্বিকার দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে ধিকিধিকি। সেই খুঁটির গোড়ায় দুটো ছাগল পুড়ে কয়লা হয়ে পরস্পর গলাগলি করে শুয়ে আছে। আব্দুল জলিল চোখ মেলে তাকাতে পারে না। দু'চোখ বন্ধ করে এক দৌড়ে মোল্লাবাড়ি পেরোতে চায়। আগুনের আগ্রাসী জিহ্বা মোল্লাবাড়ির বাইরে প্রসারিত হয়নি দেখে একটুখানি আশ্বস্ত হয়। এ গ্রামের পাঁচটা ছেলে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে, পাঁচটাই এই মোল্লাবাড়ির ছেলে। মোল্লাদের কোন জামাই যেন আর্মি ছিল, সে-ই পালিয়ে এসে শ্বশুরবাড়িতে দল পাকিয়ে সবাইকে নিয়ে ভারতে ভেগেছে। ওদের ঘর পোড়ানোর জন্যে এই কারণই যথেষ্ট। ভগ্নস্তূপের মধ্যে নারী-পুরুষের আহাজারি তাড়িয়ে ফেরে আব্দুল জলিলকে। কিন্তু এ কী, তার বাড়িতে লোকজন কই? ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে ছিটানো, যেন এখানে খানিক আগে যুদ্ধ হয়েছে। নাম ধরে ডাকতে ভুলে যায় সে। এ ঘরে ও ঘরে খুঁজে ফেরে স্ত্রী-কন্যা-পুত্র। অবশেষে ভাঁড়ার ঘরে মাটির কুঠির আড়ালে আবিষ্কার করে ধাঁধা লাগা পুত্রকে। যেন সে অনুভূতিহীন কাঠের ঘোড়া। শেষপর্যন্ত পুত্রকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সে কেঁদে ওঠে,

– কথা বল বাপ জিন্নাহ, তোর মা কোথায়? তোর বু কোথায়? জিন্নাহ নিরুত্তর। বাপের কান্না তাকে এতটুকু সংক্রমিত করে না। পাথর হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে বাপের কোলঘেঁষে। আব্দুল জলিল পুত্রের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলাতে চেষ্টা করে। কথা বলতে যদি ইচ্ছে না-ই করে, সে চায় অন্তত একবার কেঁদে উঠুক জিন্নাহ। কাঁদলেও বুক থেকে পাথর নেমে যায়।

অনেক চেষ্টার পর জিন্নাহ কেঁদে ওঠে বটে, সে কান্নার পরপর তার সংজ্ঞা হারায়। জিন্নাহর সংজ্ঞাহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই তার বাপ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে পরম মমতা ও উৎকণ্ঠায়। আর তখনি নজরে পড়ে পায়ের নিচে ছড়িয়ে থাকা কাঁচের চুড়ির ভাঙা টুকরো। লাল টুকটুকে। স্কুলে পড়া মেয়েদের চুড়ি পরা তার মোটেই পছন্দ নয়। জমিলার বহু আবদার নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে, কেন এই একটি বায়না সে পূরণ করেনি ইচ্ছে করেই। তাতে অবশ্য জমিলার সাধ অপূর্ণ থাকেনি, পাড়ার ফেরিওয়ালার কাছ থেকে ওর মা ডজনখানেক বেলোয়াড়ি চুড়ি কিনে দিয়েছে ঠিকই। ফর্সা ধবধবে হাতে লাল টুকটুকে চুড়ির সারি তার নজরে পড়েছে, খিলখিলানো হাসির মতো ঝনঝনাৎ শব্দ এসে কানে বেজেছে; তারপরও সে মেয়ে অথবা তার মাকে কিছুই বলেনি।

জমিলা এবং তার মায়ের খবর শোনার পর আব্দুল জলিলের সংজ্ঞা হারানোর দশা হয়। হাত-পা অবশ হয়ে আসে। মা-মেয়ের খোঁজ করার উদ্যম পায় না ভেতরে। কথা বলারও রুচি নষ্ট হয়ে আসে। দম ধরে বসে থাকে সারাদিন এক ঠায়। খবর পেয়ে নন্দনগর থেকে ছুটে আসে সাইফুল। আব্দুল জলিল চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে থাকে শ্যালকের দিকে, যেন তাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে তার। সাইফুল নানাভাবে চেষ্টা করে তার দুলাভাইকে স্বাভাবিক করে তুলতে। কিন্তু জলিল ফারাজি কিছুতেই মুখ খোলে না, যেন বা প্রতিজ্ঞার ধনুকে তীর বেঁধেছে টানটান। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সে একটু রেগে ওঠে,

– জমিলাকে না হয় ওরা ধরে নিয়ে গেছে, ওর মাকে তো নিয়ে যায়নি, তাকে তো খুঁজে বের করতে হবে? নাকি গুম ধরে বসে থাকলেই চলবে?

আব্দুল জলিল পূর্বাপর প্রতিক্রিয়াহীন। সেও এইরকম শুনেছে বটে, জমিলাকে টেনে হিঁচড়ে মিলিটারি জিপে তোলার সময় ওর মা ছুটে এসে আছড়ে পড়েছিল। জিপের পিছে পিছে সে নাকি উন্মাদের মতো দৌড়েছিল অনেক দূর। পিছনের ট্রাক থেমে তাকেও তুলে নিয়েছে– এ দৃশ্য নাকি দেখেছে কেউ কেউ। জলিল ফারাজি কোথায় খুঁজবে তার স্ত্রী-কন্যাকে। সে হঠাৎ মুখ খোলে এবং এতক্ষণে যেন তার শ্যালককে চিনতে পারে,

– তুই কি মুক্তি হয়েছিস সাইফুল? মুক্তি হস্‌নি?

এ সময়ে এ প্রশ্ন খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয় না সাইফুলের। সে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। জলিল ফারাজি বিরক্ত হয়,

– আমার কাছে লুকাসনে, সত্যি তুই মুক্তি হসনি সাইফুল?

সাইফুল এতক্ষণে ঘাড় নেড়ে জানায়,

– এখনো হইনি। দু'এক দিনের মধ্যেই ইন্ডিয়ায় যাব, মুক্তি হব।

– আমাকেও সঙ্গে নে সাইফুল।

হঠাৎ শ্যালকের হাত চেপে ধরে জলিল ফারাজি। তার কণ্ঠে দারুণ আকুলতা। ভীতবিহ্বল জিন্নাহর মুখটা সহসা বুকে জাপটে ধরে সে বলে,

– এই দ্যাখ, আমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলছি, আমিও মুক্তি হব।

পিতা তুমি আবার জেগে ওঠো
ইমরান পরশ

মধ্য গগনে সূর্য পড়েছে হেলে তোমার দৃপ্তময় তর্জনী ভেদ করে
সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে রেসকোর্স ময়দানে
সমির মাঝি বৈঠা হাতে এসেছে প্রতিরোধে
দেওয়ান গাজী তার নিজের বাঁশঝাড়ের পোক্ত বাঁশের লাঠি এনেছে
রাশেদ, সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ বালক হাফপ্যান্ট পরে
জয়বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত করেছে ময়দান
তোমার সেই উদাত্ত কণ্ঠ, ভায়েরা আমার
পলকেই পিনপতন নীরবতা, আবার জয়বাংলা ধ্বনি
তোমার কণ্ঠের সাথে শিস বাজিয়ে ঢেউ তুলেছে
পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী
তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাও জাগ্রত হয়েছে ফের
তোমার মুষ্টিবদ্ধ হাত সাড়ে সাত কোটি প্রাণে দিয়েছে দোলা।
সবুজ গাছগুলো থমকে দাঁড়িয়েছে তোমার আহ্বানে
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম ...
বঙ্গোপসাগরের সীমানা পেরিয়ে আছড়ে পড়েছে
ভারত মহাসাগরে
কে আর তোমার বাণী দাবায়ে রাখবার পারে!
বাঙালি এখন একাকার নেতা আর কর্মীতে
সীমানা প্রাচীর ডিঙিয়ে চাঁদও ফালি ফালি হয়ে গেল নিমেষে
ফসলি জমি তোমার ডাকে দিল সাড়া
ধানক্ষেতগুলো উঠে এল কৃষকের লাঙলের ফলার মতো
পিতা তুমি আবার জেগে ওঠো, জেগে ওঠো পিতা
টুঙ্গিপাড়ার কবর থেকে একটি বজ্রধ্বনি
আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে মিলিয়ে যাক বাঙালির ঘরে
তোমার হুংকার আজ বড্ড বেশি প্রয়োজন!

দুঃসময়: ঘরে থেকো
জাফরুল আহসান

বাইরে দারুণ ঝড় কটা দিন তুমি ঘরে থেকো
ঘরে থেকে তুমি রোগা পৃথিবীর ছবিটাই আঁকো
অসুখে ভুগছে বিশ্ব, মৃত্যু হাঁটে পায়ে পায়ে
লাশের মিছিলে এত লাশ, আহা! রাখব কোথায়!
বিশ্ব অশুচি মরণঘাতী সে কোভিড করোনা
মিনতি শোনেনি কোটি মানুষের করেনি করুণা
ভয়ানক জেদি, রাজা ও প্রজায় করেনি প্রভেদ
মৃত্যুপুরীতে শত্রু-মিত্র নেই ভেদাভেদ।
বাইরে দারুণ ঝড় কটা দিন তুমি ঘরে থাকো
ঘরে বসে তুমি বিষণ্ন ছবিটাই আঁকো;
সব ঠিক হবে হয়ে যাবে নিকানো উঠান
পাখি ফিরে যাবে নীড়ে, মধুময় গৃহ প্রাঙ্গণ।
আশা রেখ বুকে একদিন ঝড় সে তো থামবেই
বিষণ্নতায় মোড়ানো মেঘেরা জেগে উঠবেই;
লড়াকু মানুষ, মানুষ মানে না কোনো পরাজয়
সামনে সুদিন, মানুষ আমরা করবোই জয়।

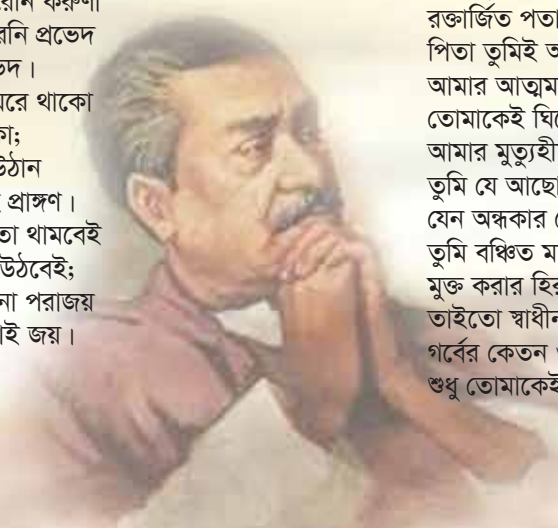

বিজয়ের সূর্য
আখতারুল ইসলাম

মুক্ত হতে যুদ্ধ বাধে সেই সে একাত্তরে
মন্ত্র শেখা স্বপ্ন বুকে দুর্গ ঘরে ঘরে।
যুদ্ধমাঠে স্বাধীনতার সুর বাজে, ভয় নাই
মৃত্যুমুখী প্রাণের কোনো এক ফোঁটা ক্ষয় নাই।
স্নেহময়ী মা'র আঁচলে ঠাঁই
পেলো কত সাহসী ভাই।
গুলির মুখে মানুষ মরার মিছিল যখন সাথে
পাকহানাদার উল্লাসে খুব মাতে।
গ্রাম থেকে গ্রাম পুড়ে হলো ছাই
ভাই হারালো বোন আর বোন হারালো ভাই।
খালবিল সব রক্তসাগর
রক্তের লালে রঙিন হলো সবুজ দূর্বাঘাস
চতুর্দিকে কান্নার ঢল আর মানুষের লাশ।
বঙ্গবন্ধুর তেজী ভাষণ ভেসে এলো কানে
নজরুলের চল্ চল্ চল্ উত্তাল গানে গানে।
রবি ঠাকুরের সোনার বাংলা কেমন যেন টানে
এক অদম্য সাহস শক্তি প্রাণে।
জয় বাংলা স্লোগানে হয় মুখর সারা দেশে
স্বাধীনতা স্বাধীনতা শব্দ উঠে ভেসে।
বাংলার জল মাটি হাওয়ায় হেসে।
ডিসেম্বরের মাঝে বাজে বিজয় রণতূর্য
পুবাকাশে পৃথিবীতে ওঠে নতুন সূর্য।

জাতির পিতা তোমাকেই মনে পড়ে
এম এস ইসলাম

জাতির পিতা তোমাকেই মনে পড়ে
মনে পড়ে প্রতিটি ক্ষণে
তুমি নেই বিশ্বাস হয় না, মানতে চায় না মন।
তুমি মিশে আছো আমার অস্তিত্বে
কাদা জল মাটিতে, জড়িয়ে আছো চেতনাজুড়ে
অসহায় বঞ্চিত মানুষের মাঝে
আপামর জনতার মাঝে
জানো, তোমার ছবি মিশে আছে
রক্তার্জিত পতাকায় আমার স্বাধীনতায়।
পিতা তুমিই আমার স্বাধীনতা
আমার আত্মমহিমার বিশ্বাস
তোমাকেই ঘিরে বসবাস করে
আমার মৃত্যুহীন শান্তির আকাঙ্ক্ষা।
তুমি যে আছো চির সুন্দর অম্লান
যেন অন্ধকার ভেদ করা আলো
তুমি বঞ্চিত মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর
মুক্ত করার হিরণ্ময় হাতিয়ার
তাইতো স্বাধীনতায় স্বপ্ন-সাধের সৌধে
গর্বের কেতন ওড়াই
শুধু তোমাকেই ভালোবেসে।

বিজয়ী সূর্য
মিজানুর রহমান মিথুন

পলাশীর প্রান্তরে ডোবা সূর্য–
শাসনে শোষণে আবার শৃঙ্খলবন্দি হয়ে পড়ে।
কাঁদে বাংলা সিরাজের শোকে
তিমিরে কাটে বহুকাল–
কখনো দস্যু, কখনো হায়েনা,
দালাল-বেনিয়া আরো কত রূপ।
যে যার মতো স্বার্থের বিষাক্ত
নখরাঘাতে বিদীর্ণ করেছে বাংলা।
আগুনে জ্বালিয়ে করেছে ছারখার,
তারপর এল মর্টার, এল গ্রেনেড,
সাঁজোয়া যান আরো কত কী!
চেয়েছিল ছো মেরে নিয়ে যেতে,
নিতে পারেনি, উঠল সূর্য,
ছাব্বিশে মার্চ মুক্তি পেল বন্দিসূর্য,
বিজয়ী সূর্য মুক্তি পেল ডিসেম্বরে।

বিজয়ের গান
সাবিত্রী রানী

একাত্তরে হানাদারের সঙ্গে লড়াই করে
বীর বাঙালি জীবন দিল এদেশ গড়ার তরে।
নারী দিল প্রেরণা শক্তি, কিশোরও অস্ত্র ধরল
আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা দেশকে স্বাধীন করল।
আজ আমরা মুক্ত স্বাধীন
দেশ নয়তো কারো অধীন।
মুক্তিযোদ্ধার তাজা রক্তে বাংলাদেশকে পাই
তাইতো মোরা আনন্দে বিজয়ের গান গাই।

মহান বিজয় দিবস
মিশরাত সরকার মুক্তি

বিজয় দিবস আকাশের বুকে শত ধ্রুবতারা,
বিজয় দিবস কত মায়ের বুক খালি করার জ্বালা।
বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বর জাতির অহংকার,
এই বিজয়কে রাখব সমুন্নত এই হোক অঙ্গীকার।
একাত্তরের সাড়ে সাত কোটি বাঙালি হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ,
ছাব্বিশে মার্চ শুরু হয় নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ।
যেদিন বাংলাদেশ থেকে পাক-শাসন যায় চলে,
সেদিনটাকে আজকে সবাই বিজয় দিবস বলে।
বিজয় কিন্তু অনেক দামি, সহজলভ্য নয়,
মুক্তিসেনা বিজয় আনে জয় করে সব ভয়।
বিজয় দিবস রক্তে ধোয়া বীর শহিদের স্মৃতি,
বিজয় নিয়েই অনেক লেখা কবিতা আর গীতি।
বিজয় মাখা ফুলে-পাতায়, বিজয় সবুজ ঘাসে,
বছর ঘুরে এদিন যেন বারে বারে আসে।

বাংলা মায়ের কোলে
ফায়েজা খানম

জনে জনে শুনি আমি
যাঁর ডাক নাম,
বাংলার বন্ধু সে যে
শেখ মুজিবুর রহমান।
উদারতার নেই তো শেষ
যেমন নীতিতে অটল,
ভালোবাসায় আপন করে
অধিকার আদায়ে সচল।
তুমি তো নদীজলে,
পাখপাখালির ডাকে,
কখনো ঐ রূপসি নারীর
বিরামহীন কলসি কাঁখে।
স্বাধীনতার বাক তুমি
তুমি যে ঢেউয়ের দোলে,
তারা হয়ে ছড়িয়ে আছ
বাংলা মায়ের কোলে।

রাজহংস
শাহরিয়ার নূরী

লড়াই করে বাঁচি, তবু কর্দমাক্ত জল
ছিটেফোটা লাগেনি গায়ে
রাজহংস হয়ে রাজপুরীতে কোমল শিশিরের দিন
বিছানো ঘাসের শরীর, নিষ্পাপ আনন্দের দিন
কাটিয়েছি কত কাল। রাতে চোখ বেয়ে
নামে কষ্টের নদী। এ লড়াই মৃত্যুর
দুয়ার অবধি। একটি আনন্দঘন সকাল
এসে জানিয়ে যায়
জীবনের সব লড়াই শেষ অবধি
লড়ে যাব, তুমি যদি থাক পাশে।

দহন বেলায়
রাবেয়া নূর

ফুল মেয়েরা কুড়ায় শিশির
শীত এল ঐ আলতো পায়ে।
মায়ার শরীর, মনের অসুখ
কি যেন এক দহন বেলায়
চুপটি করে বুকের মাঝে
মেঘহীন ঐ আকাশ রঙিন হয়ে
রাতজাগা পাখির পালক মুক্তো ঝরায়
ফুল মেয়েরা শিশির কুড়ায়
মুক্তো কুড়ায়
গলায় দিয়ে তারার মালিকা।

মুজিব যদি না জন্মাতো
গোবিন্দলাল সরকার

মুজিব যদি না জন্মাতো
লাল পতাকায় আমার দেশ
ভোর না হতেই পতপতিয়ে
কে ওড়াতো সুখের রেশ!
মুজিব যদি না জন্মাতো
শ্যাম-সবুজের মাঠখানি
কার ইশারায় উঠত জেগে
কে শোনাতো বাক-বাণী!
মুজিব যদি না জন্মাতো
কে ঘুচাতো মাৎস্যন্যায়
পঙ্গপালের দল খেদাতে
তর্জনী কার উচ্চে চায়!
মুজিব যদি না জন্মাতো
সাত তারিখের ভাষণে
বিশ্বসভায় কে হাসিতো
অমরত্বের আসনে!
মুজিব যদি না জন্মাতো
বঙ্গবন্ধু হইতো কে
খোকা থেকে বিশ্ববন্ধু
শতবর্ষের নিরিখে।

সাক্ষী
রুস্তম আলী

১৯৭১ সাল ডিসেম্বর মাস
পশ্চিম আকাশে
সূর্য ডুব- ডুব
আমরা স্বাধীন–
যেন উড়ন্ত গাঙচিল
তবে সাক্ষী দিবে কে ?
আকাশ সাক্ষী দিবে–
ক্ষণে-ক্ষণে তা তো
মেঘে যায় ঢেকে।
বাতাস সাক্ষী দিবে–
ঋতুভেদে তা বহে উলটো দিকে।
তবে সাক্ষী দিবে কে?
স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিলাম
ত্রিশ লক্ষ জীবন দিলাম
হারালাম দুই লক্ষ নারীর সম্ভ্রম
তবে সাক্ষী দিবে কে ?
দেশ স্বাধীন, আমরা স্বাধীন
তবে সাক্ষী দিবে কে ?
সাক্ষী পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা
আবহমান গঙ্গার জল
মধুমতী-বুড়িগঙ্গায় মিশে–
অবশেষে সাক্ষ্য দিলো
স্বাধীন বাংলাদেশের!

জীবন স্বপ্ন
ম. মীজানুর রহমান

বয়ক্রমে গড়িয়ে গেলে দেহ
মঞ্চে আর পায় না যে কেউ ঠাঁই।
মানব জীবন আর দেখে না কেহ
ভাঙাচোরা পাখির মতো
স্বপ্ন ওড়ার নাই।
যৌবন তো আসবে না আর ফিরে
শক্তি জোগান আসবে কোত্থেকে ?
বার্ধক্য জরায় জীবন জীর্ণ ধীরে ধীরে
মাইল খানেক যায় না যাওয়া
যাত্রা ইহলোকে।
পিছন থেকে অদৃশ্যে কেউ বলে,
না, না, না
আর হবে না যাওয়া তোমার, থামো;
এমন মজার জীবন তুমি আর পাবে না,
নতুনদের আসতে দাও
মঞ্চ থেকে নামো।

স্বাধীনতার পতাকা
হাসান আলী

স্বাধীনতার ফুলের সুবাস ছড়িয়ে গেল
সবখানে, সবখানে ঐ উড়ছে
হৃদয় রাঙা রক্তে ঝরা লাল-সবুজের
পতাকা, গড়ল কে গো ঐ পতাকা
পাখি ডেকে বলল মুজিব- মুজিব।
কার প্রেরণায় বাঙালি সব কৃষক-মজুর-শ্রমিক
গড়ল লাল-সবুজের পতাকা
আনল ছিনিয়ে বন্দি মাকে
কার প্রেরণায়, কার প্রেরণায়–
বলল পাখি মুজিব-মুজিব।

আমার গাঁ
এস. এম. মাসুদ

আমার গাঁয়ের দুই দিকেতে বয়ে গেছে নদী,
নামটি তাহার আড়িয়াল খাঁ বইছে নিরবধি।
হাওয়ায় হাওয়ায় ঢেঁউয়ের তালে নৌকা যেমন দোলে,
আমার গাঁয়ের ছোট্ট ছেলে তার মায়েরই কোলে।
আমার গাঁয়ের সোনার ফসলে পূর্ণ রয়েছে মাঠ,
শনি-মঙ্গল দুদিন মেলে বাঁশগাড়ির হাট।
সকল পেশার মানুষগুলো যায় মোদের ঐ হাটে,
মাঝি একা বসে আছে নৌকা নিয়ে ঘাটে।
কাঁটার পরে সোনার ফসল পরে থাকে মাঠে,
বউ-ঝিয়েরা কলসি নিয়ে যায় নদীর ঐ ঘাটে।
ঈদ উৎসব সবার মনে হাসি-খুশির মেলা,
আমার গাঁয়ের সকল বালক মাঠে করে খেলা।
ছেলে বুড়ো সবার মনে তাই তো এত সুখ,
রাত পোহালে আমি দেখি বাঁশগাড়ির মুখ।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে ২১শে নভেম্বর ২০২০ বঙ্গভবনে 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২০' উপলক্ষে তিন বাহিনীর প্রধানগণ সাক্ষাৎ করেন

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশকে জানতে হলে, বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। ৯ই নভেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। জাতীয় সংসদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ অধিবেশন শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, বঙ্গবন্ধু একটি প্রতিষ্ঠান, একটি সত্তা, একটি ইতিহাস। জীবিত বঙ্গবন্ধুর মতোই অন্তরালের বঙ্গবন্ধু শক্তিশালী। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি থাকবে, এ দেশের জনগণ থাকবে, ততদিনই বঙ্গবন্ধু সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে তিনি বিশ্বকে করেছেন আলোকময়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে বঙ্গবন্ধুর নীতি, আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বেড়ে উঠতে পারে, সেলক্ষ্যে সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে।

টেকসই উন্নয়নে প্রকৌশলীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, উন্নয়নকে বেগবান ও টেকসই করতে দেশের প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৭ই নভেম্বর ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইডিইবি) ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'গণপ্রকৌশল দিবস ২০২০' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ নানা চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। সমুদ্র বিজয়ের ফলে বঙ্গোপসাগরের বিশাল এলাকার ওপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হয়েছে। বিশাল এ সমুদ্র এলাকার বৈচিত্র্যময় সম্পদ আহরণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বহুল প্রত্যাশিত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে আইডিইবি'র এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য– 'নীল অর্থনীতি এনে দেবে সমৃদ্ধি' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর অবদান জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে ২১শে নভেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের এই দিনে তিন বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। তাঁদের সম্মিলিত আক্রমণে হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে যা আমাদের বিজয় অর্জনকে তরান্বিত করে। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ২১শে নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন ।

সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, সশস্ত্রবাহিনী দিবসে আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সাতজন বীরশ্রেষ্ঠকে যাঁরা মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে দেশ ও দেশের বাইরে পেশাগত দায়িত্বপালনকালে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্রবাহিনীর বীর সদস্যদের। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি। আমি সশস্ত্রবাহিনীর যুদ্ধাহত সদস্য ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। বাণীতে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, সরকার সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' প্রণয়ন করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা নিঃসন্দেহে সশস্ত্রবাহিনীকে আরো আধুনিক, দক্ষ ও গতিশীল করবে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে নভেম্বর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ডিগ্রি অর্জন করে চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে যুবকদের পরামর্শ দেন। তিনি চাকরির পেছনে না ছুটে নিজে কীভাবে কিছু করা যায়, নিজে কাজ করব, আরো দশজনকে চাকরি দেব, নিজে উদ্যোক্তা হব, নিজেই বস হব– একথাটা মাথায় রাখতে হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আজকে যারা যুবক, আগামী দিনে তারাই দেশের কর্ণধার হবে। আজকে যে শিশুটা জন্ম নিল, তার ভবিষ্যৎটা যেন উন্নত হয়, সে বিষয় চিন্তা করেই সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

দ্রুততম সময়ে বিচার নিশ্চিত করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় নবনির্মিত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী মামলার দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে দ্রুততম সময়ে রায় দেওয়ার উপায় বের করতে বিচারক এবং আইনজীবীদের নির্দেশ দেন। এছাড়া বিচারের রায় বাংলায় লেখার বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী বিচার বিভাগের উন্নয়নে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, এজলাস সংকট নিরসনের পাশাপাশি মামলা ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন।

নৌবাহিনীর পাঁচ জাহাজের কমিশনিং প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নৌবাহিনীর জাহাজ 'বানৌজা ওমর ফারুক', 'আবু উবাইদাহ', 'প্রত্যাশা', 'দর্শক' ও 'তল্লাশি'র কমিশনিং প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রসীমা রক্ষার পাশাপাশি সমুদ্রসম্পদ আহরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সমুদ্রসীমা শুধু রক্ষা করা নয়, সমুদ্রের সম্পদটাও যেন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগে সেলক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি নৌবাহিনীর সদস্যদের অবদানের প্রশংসা করেন এবং তাঁর সরকার এ বাহিনীকে আধুনিক, দক্ষ, শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রহ এবং বিদ্যমান জাহাজসমূহের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

বিজিবি'কে ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পিলখানার বিজিবি সদর দপ্তরে ২টি এমআই-১৭১ই হেলিকপ্টার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বিজিবি'কে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি অর্পিত দায়িত্ব পালনে এখন থেকে বিজিবি সদস্যরা জলে-স্থলে ও আকাশ পথে বিচরণ করবেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি বিজিবি'র সদস্যদের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং তাদের উন্নয়নে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।

জমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারি কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই নভেম্বর গণভবন থেকে মন্ত্রিসভার ভার্চুয়াল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারি কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব অনুমোদন

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৮শে নভেম্বর ঢাকায় তথ্য ভবনের অডিটোরিয়ামে 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক প্রদান ২০২০' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

করেন। এর মধ্য দিয়ে সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্বচ্ছতার সঙ্গে জমির রেজিস্ট্রেশন শেষ হওয়ার ৮ দিনের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামজারি হয়ে যাবে। এসি ল্যান্ডকে বাধ্যতামূলকভাবে সেই জমির রেকর্ড সংশোধন করতে হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা যেন জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

ভুয়া অনলাইনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে

শীঘ্রই ভুয়া অনলাইনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ২৬শে নভেম্বর রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে তাদের অনলাইন জার্নাল 'রিপোর্টার্স ভয়েস' উদ্‌বোধন ও ডিআরইউ সদস্য 'লেখক সম্মাননা ২০২০' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা জানান তিনি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে হাতেগোনা কয়েকটি অনলাইন ছিল, এখন অনলাইনের সংখ্যা অনেক, তবে সবগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সহায়ক নয়। সেজন্য আমরা অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম শুরু করেছি। আমাদের পরিকল্পনা আছে এ বছরের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমটি যতদূর সম্ভব সম্পন্ন করা। একইসঙ্গে যে সমস্ত অনলাইন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হয়, যে সমস্ত অনলাইন গুজবের সাথে যুক্ত, সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা আগামী বছর থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করব।

অনলাইন নিউজপোর্টাল রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রমটি এগিয়ে যাওয়ার পর এই আইনগত ব্যবস্থা শুরু হবে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, এটি যেমন সমাজের চাহিদা, একইভাবে সাংবাদিক সমাজেরও চাহিদা। যে অনলাইন নিউজপোর্টালগুলো সত্যিকার অর্থে সংবাদ পরিবেশনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা না করে ভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করে, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা পৃথিবীর প্রেক্ষাপট। উন্নত দেশগুলোতে এক্ষেত্রে অনেক শৃঙ্খলা স্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে, যেটি এখনো এখানে পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ সংবাদ সবার আগে দিতে গিয়ে অনেক সময় ভুল সংবাদ এবং অসত্য তথ্য পরিবেশিত হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, অনেক বেশি ক্লিক পাওয়ার জন্য দেওয়া হেডিং-এর সাথে ভেতরের সংবাদের সেই মিল নেই। বিশেষ করে যে অনলাইনগুলোতে কোনো অনুষ্ঠান চলাকালীন সংবাদ পরিবেশনের ক্ষমতা রিপোর্টারকে দেওয়া থাকে, সেখানে অনেক অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে দেখা যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটা কমিয়ে আনা সম্ভব। এ বিষয়ে পিআইবি'র সাথে যুক্ত হয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়ে থাকে, যা সত্যিই প্রয়োজনীয়।

সম্প্রীতির সোনার বাংলা গড়াই আমাদের লক্ষ্য

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই দেশে আন্তঃসম্প্রদায় সম্প্রীতি বিনষ্টের কোনো অপচেষ্টা বরদাশত করা হবে না। সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই আমাদের লক্ষ্য। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজিত 'নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক জাতি গঠন: প্যাগোডাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের ভূমিকা' ভার্চুয়াল কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। রাজধানীর মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবন থেকে ৮ই নভেম্বর দেশের ১২টি জেলার ৫৫ উপজেলার প্যাগোডাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ৩০১টি স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সকল ধর্মের মানুষের ও বাঙালিদের পাশাপাশি মগ-মুরং-চাকমা সকলের মিলিত রক্তস্রোতে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় স্বাধীন বাংলাদেশ গড়েছেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের সরকার সেই চেতনাকে সদাসমুন্নত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই দেশে আন্তঃসম্প্রদায় সম্প্রীতি বিনষ্টের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই আমাদের লক্ষ্য। এ সময় ধর্মীয় উপাসনালয়ভিত্তিক নৈতিক শিক্ষাকে উন্নত জাতি গঠনে অত্যন্ত সহায়ক বলে বর্ণনা করেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, শিশুকালই মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার ও তার মাঝে মেধা, মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ, মমত্ববোধের সমাবেশ ঘটিয়ে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ার শ্রেষ্ঠ সময়। প্যাগোডাসহ সকল ধর্মের উপাসনালয়ভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা উন্নত জাতি গড়তে অত্যন্ত সহায়ক।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই ডিসেম্বর ২০২০ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০-এর মোড়ক উন্মোচন করেন- পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস

১লা নভেম্বর : প্রতিবছরের ন্যায় সারা দেশে পালিত হয় জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস ২০২০। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেন।

জেল হত্যা দিবস পালিত

৩রা নভেম্বর: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে পালিত হয় জেল হত্যা দিবস।

একনেকে ৪ প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় দুই হাজার ৪৫৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ৪ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখায় উন্নয়ন কাজের উদ্‌বোধন

৪ঠা নভেম্বর: রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখা আঞ্চলিক মহাসড়কে জুড়ী উপজেলায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগ নির্মিত ৮২ মিটার দৈর্ঘ্যের জাঙ্গীরা সেতু উদ্‌বোধন এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জুড়ী উপজেলায় জুড়ী নদীর ওপর ৪ কোটি ৩১ লাখ টাকা ব্যয়ে বৃন্দার ঘাট পয়েন্ট এবং ৩ কোটি ৯১ লাখ টাকা ব্যয়ে কয়লাঘাট পয়েন্টে ৬০ মিটার দীর্ঘ দুটি সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন।

জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

৭ই নভেম্বর: 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'–এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়।

১৬২টি ডিজিটাল সেবার উদ্‌বোধন

৮ই নভেম্বর: সেবাব্যবস্থা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৬২টি ডিজিটাল সেবার উদ্‌বোধন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক।

শহিদ নূর হোসেন দিবস পালিত

১০ই নভেম্বর: শহিদ নূর হোসেনকে সকল স্তরের জনগণ শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন।

ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের এক দশকপূর্তি

১১ই নভেম্বর: ২০১০ সালের ১১ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়নে একযোগে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন, যা বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার নামে পরিচিত। ২০২০ সালের ১১ই নভেম্বর এর এক দশকপূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী নানান কার্যক্রম সংগঠিত হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের নতুন আদেশ জারি

১৫ই নভেম্বর: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন আদেশ ২০২০ জারি করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ আদেশ দ্বারা এ সংক্রান্ত ২০০৫ সালের আদেশ রহিত করেছে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস

'ডায়াবেটিস সেবায় পার্থক্য আনতে পারেন নার্সরাই'–এ প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হলো এবারের বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস।

প্রথমবারের মতো পালিত হয় রেল দিবস

বাংলাদেশ রেলওয়ের ১৫৮ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রেল দিবস পালন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই নভেম্বর ২০২০ জাতীয় সংসদ ভবনে একাদশ সংসদের দশম অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তৃতা করেন- পিআইডি

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালন

১৯শে নভেম্বর: প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগ-দুর্ঘটনার বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সারা দেশে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌যাপিত হয়।

সশস্ত্রবাহিনী দিবস পালন

২১শে নভেম্বর: মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে সশস্ত্রবাহিনী দিবস পালিত হয়।

ইনডিভিজুয়াল হেলথ আইডি কার্ড

২২শে নভেম্বর: সবার হবে ইনডিভিজুয়াল হেলথ আইডি কার্ড। রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে হেলথ আউটকাম পরিমাপ এবং ইনডিভিজুয়াল হেলথ আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন

২৩শে নভেম্বর: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ১৬ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫শে নভেম্বর-১০ই ডিসেম্বর) পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য– 'কমলা রঙের বিশ্বে নারী, বাধা পথ দেবেই পাড়ি'।

একনেকে ৭ প্রকল্পের অনুমোদন

২৪শে নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১০ হাজার ৭০২ কোটি ২৩ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ৭ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২৯শে নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রতিবেদন: শরিফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১০ই নভেম্বর পৃথক অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, নতুন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের মেয়াদে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

জো বাইডেনকে পাঠানো অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হওয়ার সাম্প্রতিক নির্বাচনে আপনার বিজয়ে আমি এবং বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আপনার বিচক্ষণ নেতৃত্ব বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায়, সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আরো শক্তিশালী করবে।

'উইটসা গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স' পুরস্কার

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য 'উইটসা গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স' পুরস্কার পেল বাংলাদেশের ৬টি প্রতিষ্ঠান। মালয়েশিয়ায় ১৮ই নভেম্বর শুরু হওয়া তিনদিনের ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডব্লিউসিআইটি) সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কৃত করা হয়। চারটি বিভাগে রানার্সআপ এবং দুটি বিভাগে মেরিট পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো। রানার্সআপ পুরস্কার পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– কোভিড-১৯ টেক সলিউশন ফর সিটিজ অ্যান্ড লোকালিটিজ বিভাগে সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের এটুআই প্রকল্প এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সিনেসিস আইটি লিমিটেডের যৌথ প্রকল্প। প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিভাগে সরকারের ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ একাডেমি (আইডিয়া) প্রকল্প। ইনোভেটিভ ই-হেলথ সলিউশন বিভাগে মাইসফটের মাই হেলথ বিডি এবং ভার্চুয়াল হসপিটাল অব বাংলাদেশ। ই-এডুকেশন অ্যান্ড লার্নিং বিভাগে বিজয় ডিজিটাল।

অন্যদিকে মেরিট পুরস্কার পেয়েছে– ডিজিটাল অপরচুনিটি অব ইনক্লুশন বিভাগে নগদ এবং সাসটেইনেবল বিভাগে ডিভাইন আইটি লিমিটেডের পিজম ইআরপি।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বিনামূল্যে করোনার টিকা দেবে সরকার

সরকার বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের তিন কোটি ডোজ টিকা বিতরণ করবে। মহামারি মোকাবিলায় যারা সামনে থেকে কাজ করছেন, তাদের মধ্যে আগে এই টিকা বিতরণ করা হবে। ৩০শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা

বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এবং সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবরা বৈঠকে অংশ নেন। ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে উৎপাদিত অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের তিন কোটি ডোজ সংগ্রহের প্রস্তাবে গত ১৪ই অক্টোবর অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর ৫ই নভেম্বর সেরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সঙ্গে সরকার চুক্তিও করেছে।

মিথ্যা তথ্য দিলে শাস্তি

মন্ত্রিসভার ৩০শে নভেম্বর বৈঠকে জাতীয় জরুরি সেবা নীতিমালা ২০২০-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, জাতীয় জরুরি সেবার হটলাইন ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে মিথ্যা, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিলে তাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে দণ্ডবিধি অনুযায়ী সাজা দেবে সরকার। রাষ্ট্রীয় সম্পদ, জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, অপরাধ দমন, জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। জনজীবনের সফলতা ও সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ সংক্রান্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের নতুন আদেশ

মৃত্যুর পর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শনের নতুন আদেশ জারি করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৫ই নভেম্বর এ আদেশ জারি করা হয়। এর ফলে ২০০৫ সালের এ-সংক্রান্ত আদেশটি বাতিল হয়ে গেছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। নতুন এই আদেশে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রমাণকের যে-কোনো একটিতে নাম থাকতে হবে।

রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শনের নিয়মের বিষয়ে আদেশে বলা হয়েছে, মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার কফিন জাতীয় পতাকা দ্বারা আবৃত করতে হবে। তবে সৎকার বা সমাধিস্থ করার আগে জাতীয় পতাকা খুলে ফেলতে হবে। অনুমোদিত প্রতিনিধি কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। অনুমোদিত সংখ্যক পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের দিয়ে সশস্ত্র সালাম প্রদান করতে হবে এবং বিউগলে করুণ সুর বাজাতে হবে। সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গার্ড অব অনার পরিচালনা করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় বা জনগুরুত্বপূর্ণ কাজের কারণে থাকতে না পারলে থানার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। সশস্ত্রবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বাহিনীর নিজস্ব রীতি অনুসরণ করতে হবে। আদেশে আরো বলা হয়, বীর মুক্তিযোদ্ধার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী এবং ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী সৎকার বা সমাধিস্থ করতে হবে। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ই-কমার্স মুভার্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে 'ওভাই'

'ই-কর্মাস মুভার্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০' অর্জন করেছে বাংলাদেশের দেশীয় রাইড শেয়ারিং স্টার্টআপ 'ওভাই'। ৮ই নভেম্বর রাজধানীর পূর্বাচল ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত

অনুষ্ঠানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং ই-ক্যাবের প্রেসিডেন্ট শমী কায়সার পুরস্কারটি প্রদান করেন 'ওভাই'-এর হেড অব গ্রোথ তাবাসসুম জামালকে। উল্লেখ্য, সাধারণ রোগী ও চিকিৎসাসেবা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দৈনন্দিন যাতায়াতে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ সেবা প্রদানে ২০২০ সালের মার্চ থেকে বাড়তি সুরক্ষা অবলম্বনের

মাধ্যমে নতুন সেবা 'ওভাই' সেবা চালুর উদ্যোগ নিয়ে প্রশংসিত হয়।

ডিজিটাল সেন্টারের সেবা পাচ্ছে মাসে ৬০ লাখ নাগরিক

দেশের প্রায় সাড়ে ছয় হাজারের বেশি ডিজিটাল সেন্টার থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৬০ লাখ নাগরিক সেবা পাচ্ছে। দেশজুড়ে এসব ডিজিটাল সেন্টারে কাজ করছেন প্রায় ১৩ হাজার তরুণ উদ্যোক্তা। ১১ই নভেম্বর ডিজিটাল সেন্টার চালুর ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনলাইন সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম জানান, এক সময় ফিজিক্যাল কানেকটিভিটির দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এটা সহজ ছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এখন ডিজিটাল কানেকটিভিটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেটি অনুধাবন করেছেন এবং আমাদেরকে সেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

নৌপথে আসামে সিমেন্ট রপ্তানি শুরু

ভারতের ত্রিপুরার পর এবার বাংলাদেশ থেকে নৌপথে আসামে সিমেন্ট রপ্তানি শুরু হয়েছে। ৮ই নভেম্বর নারায়ণগঞ্জের প্রিমিয়ার সিমেন্টের কারখানা থেকে এমভি প্রিমিয়ার নামের একটি জাহাজ সিমেন্ট নিয়ে আসামের করিমগঞ্জের পথে রওনা হয়। সিমেন্ট বোঝাই জাহাজটি মেঘনা নদী হয়ে প্রথমে আশুগঞ্জ, পরে মেঘনা নদী থেকে সিলেটের কুশিয়ারা নদী সীমান্ত এলাকা জকিগঞ্জ পৌঁছায়; সেখান থেকে আসামের করিমগঞ্জে নোগর করে। এই নৌপথ আগে থেকেই পোর্ট অব কলের আওতায়। তবে এবারই প্রথম আসামে প্রিমিয়ার সিমেন্টের এই চালানের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি শুরু হয়েছে।

করোনায় গার্মেন্টসকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী ও দৃঢ় পদক্ষেপে করোনার মধ্যেও শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। গার্মেন্টসসহ সকল কলকারখানার উৎপাদন স্বাভাবিক রেখে সরকার অর্থনীতি সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে। ৮ই নভেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এবং গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ইমপ্রুভড নিউট্রিশন-গেইনের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, করোনার শুরুতেই সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত গার্মেন্টসকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গার্মেন্টস খাতের ওপর করোনার প্রভাব কমাতে ৩১-দফা নির্দেশনা জারি করা হয়। সরকারের প্রচেষ্টায় উন্নয়ন অংশীদাররাও সহায়তা করছেন বলে জানান তিনি। এছাড়া গার্মেন্টস শ্রমিকদের কল্যাণে তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীনে তহবিল সহায়তার কথাও তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী জানান, গার্মেন্টস শ্রমিকদের মৃত্যুজনিত, স্থায়ী পঙ্গুত্ব, দুর্ঘটনায় আহত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা হিসেবে প্রায় ৮৭ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে অনলাইন শিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ১৩ই নভেম্বর ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত অনলাইন সিম্পোজিয়ামের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল

মাধ্যমে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারিতে অনলাইনে শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি ভবিষ্যতে শিক্ষা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। এছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষতামূলক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

মাধ্যমিকে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পাঠদান শুরু

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০ দিনের সংক্ষিপ্ত সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে। এর আলোকে পাঠদান শুরু হবে। পাঠদান শুরুর পর সাপ্তাহিক অ্যাসাইনমেন্টের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করার নির্দেশনা দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠদান শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর আগে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বার্ষিক পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

মাউশি জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে বাড়ির কাজ ও অ্যাসাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। পাঠ্যসূচি ও মূল্যায়ন টুলস তৈরির জন্য নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮ সপ্তাহ পাওয়া যাবে। কোন সপ্তাহে শিক্ষার্থীর কী মূল্যায়ন করা হবে তার নির্দেশনা সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম সপ্তাহে মূল্যায়নের পর দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রস্তুতি নিতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে ৮ সপ্তাহ শেষে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন কার্যক্রম শেষ হবে। এক্ষেত্রে কিছু বিষয় অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পুনর্বিন্যাস করা সিলেবাস শেষ করতে হবে। প্রস্তাবিত মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক বিষয়ে একটি করে কাজ দিতে হবে। প্রত্যেক বিষয়ে ৮ সপ্তাহে প্রস্তাবিত ৮টি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক কাজের মূল্যায়ন করবেন। এ কার্যক্রমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সব মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে চায় তুরস্ক

তুরস্ক বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে আগ্রহী বলে জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান। ১৬ই নভেম্বর বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির কার্যালয়ে মত বিনিময়কালে একথা জানান তিনি।

এসময় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় স্থান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০ স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশ ইতোমধ্যে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ সরকার আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে বিনিয়োগকারীদের। তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক দীর্ঘদিনের এবং বাণিজ্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশি না হলেও বাংলাদেশ বেশি রপ্তানি করে তুরস্কে। বাংলাদেশের পাট পণ্যের বড়ো ক্রেতা এই দেশটি। তুরস্কে ৪৫৩ দশমিক ৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী ইউরোপের ৩টি দেশ

বাংলাদেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। ফলে বিশাল বাজার সম্ভাবনার বিষয়টি মাথায় রেখে খাদ্য ও কৃষি খাতে বিনিয়োগে সুইডেনের ব্যবসায়ীদের আগ্রহী করে তুলেছে বলে মন্তব্য করেন ঢাকায় নিযুক্ত সুইস রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে। ৩রা নভেম্বর আগারগাঁওয়ে বিডা কার্যালয়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে একথা বলেন সুইডিশ রাষ্ট্রদূত।

এসময় বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এসপেন রিকটার ভেন্ডসেন বলেন, নরওয়ে সবসময়ই বাংলাদেশের উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে, বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে নরওয়ের বিশাল বিনিয়োগ রয়েছে, যা বাংলাদেশের উন্নয়নে অন্যতম অংশীদার। এসময়ে তিনি বাংলাদেশে লাভজনক বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে নরওয়ে বাংলাদেশে গ্রিন টেকনোলজি, সোলার এনার্জি, পাট ও পাটজাত দ্রব্যে বিপুল বিনিয়োগে আগ্রহী। ডেনিশ রাষ্ট্রদূত উইনি এসট্রুপ পেটারসন এসময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন ।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

এশিয়া লিটারেরি পুরস্কার পেলেন শাহীন আখতার

কথাসাহিত্যিক শাহীন আখতার এবছর এশিয়া লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তিনি তাঁর তালাশ উপন্যাসের জন্য এ পুরস্কার পেয়েছেন। ১লা নভেম্বর এশিয়া লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়াংজু শহরে এশিয়া লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল এবার করোনা মহামারির কারণে অফলাইন ও অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনের অন্যতম অংশ হচ্ছে এশিয়া লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড প্রদান।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে ৯ই ডিসেম্বর ২০২০ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণে অনবদ্য অবদানের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বেগম মুশতারী শফিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে বেগম রোকেয়া পদক ২০২০ প্রদান করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা- পিআইডি

শাহীন আখতারের *তালাশ* উপন্যাস প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। একই বছরে প্রথম আলো বর্ষসেরা বই হিসেবে *তালাশ* পুরস্কৃত হয়। ২০১১ সালে 'দ্য সার্চ' নামে *তালাশ*-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে দিল্লির প্রকাশনা হাউস জুবান। *তালাশ* কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। শাহীন আখতার এর আগে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কথাসাহিত্য পুরস্কার ও আইএফআইসি ব্যাংক পুরস্কার, জেমকন সাহিত্য পুরস্কার এবং এবিপি আনন্দ থেকে 'সাহিত্যে সেরা বাঙালি' সম্মাননা পেয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো নারীকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেছে নিয়েছে দেশটির জনগণ। আর তিনি হলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেনের রানিং মেট কমলা হ্যারিস। যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা ভোটাধিকার পাওয়ার প্রায় ১০০ বছর পর দেশটির গুরুত্বপূর্ণ দুই পদের একটিতে প্রথম নিজেদের প্রতিনিধি পেলেন নারীরা। এবারে ৩রা নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এ ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে।

কমলা ২০০৩ সালে প্রথমবার নির্বাচনে জিতে ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি নির্বাচিত হন। ২০১০ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল নির্বাচিত হন। ২০১৬ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালে কমলা বিয়ে করেন আইনজীবী ডগলাস এমহফকে।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় এবার রেকর্ড সংখ্যক নারী সদস্য

যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসে এবার রেকর্ড সংখ্যক নারী সদস্য দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে নির্বাচনে অনেক নারী জয়লাভ করেছেন। নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের সেন্টার ফর আমেরিকান উইমেন অ্যান্ড পলিটিকস (সিএডব্লিউপি) ৫ই নভেম্বর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেছে, অন্তত ১৩১ জন নারী এবারের নির্বাচনে জিতে ১১৭তম কংগ্রেস সদস্য হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০০ জন ডেমোক্রেটিক পার্টির এবং ৩১ জন রিপাবলিকান পার্টির। বর্তমান কংগ্রেসে ১২৯ জন নারী সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। এবছর প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হতে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিলেন ৫৮৩ জন নারী, এটিও একটি রেকর্ড।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

ভূমি-গৃহহীন ৭৫টি পরিবার পাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নীলফামারী সদর উপজেলার চারটি ইউনিয়নে প্রথম পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন ৭৫টি পরিবার পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর উপহার। প্রত্যেককে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে খাস জমিতে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে নির্মাণকাজও শুরু হয়েছে।

১৩ই নভেম্বর সদর উপজেলার টুপামারী ইউনিয়নে সুখধন গ্রামে ঘর নির্মাণকাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জেলা প্রশাসক হাফিজুর রহমান চৌধুরী। এতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষদের পুনর্বাসন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৭৫টি বরাদ্দ পাওয়া গেছে, যা বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন। সুখধন গ্রামে ১০টি পরিবার পুনর্বাসিত হচ্ছে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষিকে লাভজনক করতে কাজ করছে সরকার

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কৃষকেরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না। এটি নিশ্চিত করতে হলে কৃষিকে আধুনিকীকরণ করতে হবে। আধুনিকীকরণের একটি দিক হলো মাঠপর্যায়ে উন্নতজাত, প্রযুক্তি, কৃষি উপকরণের ব্যবহার, অন্যদিক হলো এগ্রো-প্রসেসিং করা। এগ্রো-প্রসেসিং করে কীভাবে কৃষিকে লাভজনক করা যায় সেলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। যে-কোনো মূল্যে কৃষিকে বাণিজ্যিক ও লাভজনক কৃষিতে রূপান্তর করতে সরকার বদ্ধপরিকর। ৮ই নভেম্বর কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে ভার্চুয়ালি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'কোভিড পরবর্তী সময়ে ফুডভ্যালু চেইন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

সাড়ে ১১ লাখ কৃষক পাচ্ছেন সার-বীজ

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি রবি মৌসুমে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় সাড়ে ১১ লাখ কৃষককে ৯৮ কোটি ৫৪ লাখ ৫৫ হাজার ৩০০ টাকার সার ও বীজ দেবে সরকার। সম্প্রতি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে এসব জেলার ডিসিদের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। সরকার রবি মৌসুমে গম, সরিষা, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম, মসুর, খেসারি, টমেটো এবং মরিচ চাষের জন্য দেশের ৫১ জেলায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বিনামূল্যে এসব বীজ ও সার দেবে। ৪ই নভেম্বর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে এই তথ্য জানা যায়।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কাজে আগ্রহী সুইডেন

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে (Alexandra Berg Von Linde) সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় তারা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১০ই নভেম্বর সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাতে রাষ্ট্রদূত জানান, সুইডেনের সরকার ও ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সম্পর্কে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। এসময় জ্বালানি খাত, সঞ্চালন ও বিতরণ, বর্জ্য থেকে জ্বালানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সাশ্রয়ী জ্বালানি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সঙ্গে নবনিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে

সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও কৃষির সম্ভাবনা

সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে কৃষির সমন্বয় ঘটালে নতুন আশা সৃষ্টি হতে পারে। বড়ো সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র যেমন উৎপাদনে আসছে আবার নতুন নতুন কেন্দ্র নির্মাণ শুরু হচ্ছে। জ্বালানি খরচ ছাড়াই বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা এখন সফল হচ্ছে। স্থলভাগের সঙ্গে ছাদে বড়ো আকারের সৌর প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ জোরেশোরে শুরু হয়েছে।

সৌরবিদ্যুতের একবার প্যানেল বসালে অন্তত ২০ বছর বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। কেন্দ্র নির্মাণের জন্য একবার জমি কিনলে বা অধিগ্রহণ করলে অনন্তকাল ধরে তা ব্যবহার করা যায়। ফলে প্রথম কেন্দ্র নির্মাণের ২০ বছর পর নতুন করে একই জায়গায় প্যানেল বসানো ছাড়া অন্যান্য খরচ প্রয়োজন হলেও জমি আর প্রয়োজন হয় না। ফলে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ আরো কমে আসবে।

প্রতিবেদন : রিপা আহমেদ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনভূমি পুনরুদ্ধারে কাজ করছে সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, অবৈধভাবে দখলকৃত সরকারি বনভূমি পুনরুদ্ধার, পাহাড় ও টিলা কর্তন রোধ, লাইসেন্সবিহীন ইটভাটা এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করতে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে সরকার। তিনি বলেন, শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, নদী দূষণসহ সার্বিক পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণসহ নদীনালা, জলাশয়, পুকুর ভরাট রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

২২শে নভেম্বর বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সারা দেশে বৃক্ষরোপণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পালনের জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় সারা দেশে ১০ লাখ বৃক্ষরোপণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাপাউবো) ঢাকার প্রধান ভবন ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস প্রাঙ্গণ এবং বাপাউবো'র আওতাধীন সকল প্রকল্প এলাকায় বৃক্ষরোপণের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে বাপাউবো'র উদ্যোগে ১০ লাখ ৩ হাজার ৯৯৭টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে এবং বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

২৯১টি বাস রুটকে ৪২টি করার প্রস্তাব

মেগাসিটি ঢাকায় ২৯১টি রুটে গণপরিবহণ চলাচল করছে। এত রুট হওয়ার কারণে প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলতে গিয়ে নিয়মিত যানজট ও দুর্ঘটনা ঘটছে। এ কারণে সরকার বাসের রুট কমিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে। ১০ই নভেম্বর এ সংক্রান্ত কমিটির ১৩তম সভায় জানানো হয়েছে, আগামী বছরের মধ্যে বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রম দৃশ্যমান পর্যায়ে যেতে পারে।

নগর ভবনের বুড়িগঙ্গা হলে গণপরিবহণে শৃঙ্খলা আনয়ন ও যানজট নিরসনে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, রাজধানীতে বর্তমানে চলাচলকারী বাসগুলোর ২৯১টি রুট রয়েছে। এসব বাসের মালিক আড়াই হাজার ব্যক্তি। রুট কমিয়ে ৪২টি ক্লাস্টার রুটে নিয়ে আসা এবং ২৫০০ বাস মালিকের চলাচলকারী বাসগুলোকে সন্নিবেশ করে ২২টি কোম্পানি করার প্রাথমিক প্রস্তাবনার রিপোর্ট ১০ই নভেম্বর বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। রিপোর্ট আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছি। এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন হলে বর্তমান বাস মালিকরা কোম্পানিগুলোর শেয়ারহোল্ডার হবেন। আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালের কারণে ঢাকায় যানজট বাড়ছে জানিয়ে মেয়র বলেন, উত্তর সিটি করপোরেশনের মহাখালী ও

গাবতলী এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের শুধু সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল আছে। টার্মিনালগুলোতে বাসগুলোর সঙ্কুলান হয় না, ফলে বাসগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ওপর রাখা হয়। এ কারণে বড়ো ধরনের যানজট সৃষ্টি হয়। বাস রুট রেশনালাইজেশন বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তঃজেলা বাসগুলোকে আর ঢাকা মহানগরের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাইরের বাসগুলো ঢাকা শহরের সীমান্তবর্তী এলাকায় নির্ধারিত আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালে যাত্রী নামিয়ে তাদের নির্ধারিত গন্তব্যে চলে যাবে। তারপর সেসব টার্মিনাল থেকে সিটি সার্ভিস বা এমআরটি বা সেবা প্রদানকারী বাহনের মাধ্যমে যাত্রীরা নিজ গন্তব্যে যাতায়াত করবেন। এতে গাড়ির চাপ কিছুটা হলেও কমবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের সব মানুষ পর্যায়ক্রমে করোনা ভ্যাকসিন পাবে

বাংলাদেশের সব মানুষই পর্যায়ক্রমে করোনার ভ্যাকসিন পাবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। ৮ই নভেম্বর বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তফা ওসমান তুরান সচিবালয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি একথা জানান।

বৈঠকে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, ৫ই নভেম্বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট ও বেক্সিমকো ফার্মার মধ্যে করোনা ভ্যাকসিন সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় কোম্পানি বেক্সিমকো ফার্মার মাধ্যমে বাংলাদেশকে তিন কোটি ভ্যাকসিন দেবে। তিনি আরো বলেন, সরকার প্রথমে তিন কোটি ভ্যাকসিন দিয়ে করোনা প্রতিরোধে কাজ শুরু করলেও পর্যায়ক্রমে আরো ভ্যাকসিন আমদানি করে দেশের সব মানুষকেই ভ্যাকসিন দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে।

মাস্ক পরা বিষয়ে নির্দেশনা

করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও মাঠ পর্যায়ে সবাইকে মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ৪ঠা নভেম্বর তথ্য অধিদফতর থেকে প্রকাশিত এক তথ্য বিবরণীতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। নির্দেশনায় বলা হয়, আসন্ন শীতে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক

মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। করোনা ভাইরাসের সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউয়ের সংক্রমণ মোকাবিলায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ৮ই নভেম্বর এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের আগে মাস্ক পরার বিষয়টি মসজিদের মাইকে প্রচার করা হবে। মসজিদের ফটকে মাস্ক পরার বিষয়টি উল্লেখ করে ব্যানার প্রদর্শন করতে হবে। এটি বাস্তবায়ন করবে মসজিদ কমিটি। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরে উপাসনালয়ে প্রবেশ করবেন। এখানেও প্রধান ফটকে ব্যানারে বিষয়টি প্রদর্শন করতে হবে। এটিও বাস্তবায়ন করবে উপাসনালয় কমিটি। নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে, কিছুক্ষণ পর পর সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়াসহ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জারি করা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে হবে। 'নো মাস্ক

নো সার্ভিস' বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

হেলথ আইডি কার্ড

রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের হলরুমে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ২২শে নভেম্বর হেলথ আউটকাম পরিমাপ এবং ইনডিভিজুয়াল হেলথ আইডি কার্ড বিতরণ করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক। হেলথ আইডি কার্ড প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এই কার্ডে একজন মানুষের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সংযুক্ত থাকবে। কম্পিউটারের সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই তথ্য একজন চিকিৎসক দ্রুত দেখতে সক্ষম হবেন। কার্ডটি সঙ্গে নিয়ে চিকিৎসা নিতে গেলে এই কার্ডের মাধ্যমে কম্পিউটারের সফটওয়্যারে রোগীর পূর্ব তথ্য দেখে চিকিৎসক সহজেই চিকিৎসা দিতে সক্ষম হবেন। এই কার্ডের মাধ্যমে এখন দেশের প্রান্তিক জনগণও খুব সহজেই স্বাস্থ্যসেবা লাভ করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের দক্ষতার সনদ দেবে সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের অর্জিত দক্ষতার সনদের ব্যবস্থা করছে সরকার। তিনি আরো বলেন, কর্মীরা তাদের পূর্ব অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতি পেলে গুণগত শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত হবে এবং রেমিট্যান্সের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

৪ঠা নভেম্বর জুম অনলাইনে দেশের ৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের পূর্ব অর্জিত দক্ষতার সনদ প্রদান কার্যক্রমের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, দক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে রিকগনিশন অব প্রায়োর লার্নিং (আরপিএল) ছাড়াও আরো অনেক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. শামসুল আলমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন। তিনি বলেন, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের পূর্ব অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতি দিতে তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সনদ প্রদান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা দেশে ও বিদেশে উচ্চ বেতনের কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। তিনি আরো বলেন, সরকার বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নানা ধরনের পুর্নবাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত ছিল আবেদন করার শেষ সময়। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুই ধাপে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৮০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা এবং ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাসহ মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। প্রথমে নেওয়া হয় এমসিকিউ বা বহু নির্বাচনী পরীক্ষা। প্রশ্ন করা হবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান- এ চারটি বিষয়ে। প্রতিটি বিষয় থেকে ২০টি করে মোট ৮০টি প্রশ্ন থাকে। পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ সময় ৮০ মিনিট বা ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। একটি ভুল উত্তরের জন্য কাটা যাবে ০.২৫ নম্বর। ফলে চারটি প্রশ্নের ভুল উত্তর দিলে ১ নম্বর কাটা যাবে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ডাকা হয় মৌখিক পরীক্ষায়। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এসএসসি ও এইচএসসি'র পাঠ্যবইয়ের প্রতি বেশি নজর দিতে হবে। বাংলা অংশে ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিষয়ে প্রশ্ন থাকে। ইংরেজিতে প্রশ্ন আসে গ্রামার থেকে। গণিতে পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি থেকে প্রশ্ন থাকে। সাধারণ জ্ঞান অংশে বাংলাদেশ বিষয়াবলি, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ও সাম্প্রতিক নানা বিষয়ে প্রশ্ন থাকে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

পদ্মা সেতুর ৫,৮৫০ মিটার দৃশ্যমান

সম্পন্ন হলো পদ্মা সেতুর ৩৯তম স্প্যান বসানোর কাজ। ৩৮তম স্প্যান বসানোর ছয় দিনের মাথায় এই স্প্যান বসানো হলো। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয়। ২০১৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর খুঁটিতে প্রথম স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয় পদ্মা সেতু। এরপর একে একে বসানো হয় স্প্যানগুলো। এতে দৃশ্যমান হয়েছে সেতুর পাঁচ হাজার ৫৫০মিটার। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ বহুমুখী সেতুর মূল আকৃতি হবে দোতলা। কংক্রিট ও স্টিল দিয়ে নির্মিত হচ্ছে এ সেতুর কাঠামো। পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ২০২১ সালেই খুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। মোট ৪২টি পিলারে ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪১টি স্প্যান বসিয়ে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। সবকটি পিলার

লালবাগ কেল্লা, ঢাকা

এরই মধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। মূল সেতু নির্মাণের জন্য কাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (এমবিইসি) এবং নদী শাসনের কাজ করছে দেশটির আরেকটি প্রতিষ্ঠান সিনো হাইড্রো করপোরেশন। দুটি সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণ করেছে বাংলাদেশের আবদুল মোমেন লিমিটেড।

দর্শনা-মুজিবনগর-মেহেরপুর ৪২ কিমি. রেললাইন নির্মাণ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর ও মেহেরপুর জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দর্শনা থেকে দামুড়হুদা ও মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন করে ৪১ দশমিক ৭০ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেললাইন করতে হবে। এই রেললাইন নির্মাণে আপাতত সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছে এক হাজার ৪৩ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে সমীক্ষার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থেকে দামুড়হুদা ও মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১২ কোটি ৪৮ লাখ ১৩ হাজার টাকা।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

ঐতিহাসিক নিদর্শন লালবাগ কেল্লা

পুরান ঢাকার অন্যতম ঐতিহাসিক নিদর্শন লালবাগ কেল্লা। ঢাকা কেন্দ্রমূলে প্রাচীন এই দুর্গটি মোগল আমলে স্থাপিত হয়। লালবাগ কেল্লা মোগল আমলের একমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন। কেল্লাটিতে একইসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে কষ্টি পাথর, মার্বেল পাথরসহ নানা রং-বেরঙের টালি। লালবাগের কেল্লা ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শনে এমন বৈচিত্র্যময় সংমিশ্রণ পাওয়া যায় না। লালবাগ কেল্লা পুরনো ঢাকার লালবাগে অবস্থিত। জায়গার নাম অনুসারে লালবাগ কেল্লার নামকরণ হয়। বর্তমানে এই কেল্লাটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র আজম শাহ ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা সুবেদারের বাসস্থান হিসেবে এই দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন। দুর্গের নির্মাণকাজ শেষ হবার পূর্বেই বিদ্রোহ দমনের জন্য আওরঙ্গজেব তাকে দিল্লি ডেকে পাঠান। দুর্গের কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। নবাব শায়েস্তা খান ১৬৮০ সালে ঢাকায় এসে পুনরায় দুর্গের কাজ শুরু করেন। শায়েস্তা খানের কন্যা পরীবিবির সঙ্গে আজম শাহের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। হঠাৎ করেই পরীবিবির মৃত্যু হয়। শায়েস্তা খান এই দুর্গকে অপয়া মনে করে এর নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন। পরীবিবিকে দরবার হলে ও মসজিদের মাঝখানে সমাহিত করা হয়। শায়েস্তা খান দরবার হলে বসে রাজরাজ্য পরিচালনা করতেন। কন্যার মৃত্যু সইতে না পেরে শায়েস্তা খান আগ্রা চলে যান। ১৯১০ সালে লালবাগ কেল্লা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে আনা হয়। নির্মাণের ৩০০ বছর পরে গত শতকের আশির দশকে দুর্গের সংস্কার করে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

প্রশস্ত এলাকা নিয়ে লালবাগ কেল্লা অবস্থিত। কেল্লার চত্বরে তিনটি স্থাপনা রয়েছে। দরবার হল, হাম্মাম খানা ও পরীবিবির মাজার। গ্রীষ্মকালে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কেল্লা খোলা থাকে। শীতকালে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা। রোববার পূর্ণ দিবস ও সোমবার অর্ধদিবস কেল্লাই বন্ধ থাকে। এর প্রবেশমূল্য জনপ্রতি ২০ টাকা। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবেশমূল্য ৫ টাকা।

প্রতিবেদন: ফারিহা রেজা

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা

৩রা ডিসেম্বর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯ ঘোষণা করা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের নামসমূহ: ২০১৯-এ *আবার বসন্ত*-এর জন্য সেরা অভিনেতা হয়েছেন তারিক আনাম খান, *ন ডরাই*-এর জন্য সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন সুনেরাহ বিনতে কামাল। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র যৌথভাবে তানিম রহমান অংশু পরিচালিত *ন ডরাই* এবং তৌকীর আহমেদ পরিচালিত *ফাগুন হাওয়ায়*। আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন মাসুদ পারভেজ সোহেল রানা ও কোহিনূর আক্তার সুচন্দা। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্বচরিত্রে *ফাগুন হাওয়ায়* ছবির জন্য ফজলুর রহমান বাবু, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্বচরিত্রে *মায়া দ্য লস্ট মাদার* ছবির জন্য নারগিস আক্তার পুরস্কার পাচ্ছেন। জাহিদ হাসান *সাপলুডু* ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খলচরিত্রে পুরস্কার পাচ্ছেন। যুগ্মভাবে শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী পুরস্কার পাচ্ছেন *কালো মেঘের ভেলা* ছবির জন্য নাইমুর রহমান আপন এবং *যদি একদিন* ছবির জন্য আফরিন আক্তার। *মায়া দ্য লস্ট মাদার* ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক পুরস্কার পাচ্ছেন মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ইমন। *মনের মতো মানুষ পাইলাম না* ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক পুরস্কার পাচ্ছেন হাবিবুর রহমান। মৃণাল কান্তি দাস *শাটল ট্রেন* ছবির 'তুমি চাইয়া দেখ' গানের জন্য শ্রেষ্ঠ গায়ক হচ্ছেন। শ্রেষ্ঠ গায়িকা হচ্ছেন যুগ্মভাবে মমতাজ বেগম ও ফাতিমা তুয যাহরা ঐশী *মায়া দ্য লস্ট মাদার*-এর 'বাড়ির ওই পূর্বধারে' ও 'মায়া, মায়া রে' গানগুলোর জন্য। কবি নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে যুগ্মভাবে শ্রেষ্ঠ গীতিকার পুরস্কার পাচ্ছেন ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী (কবি কামাল চৌধুরী)। তাঁরা দুজন যথাক্রমে *কালো মেঘের ভেলা* ছবির *ইস্টিশনে জন্ম আমার* ও *মায়া দ্য লস্ট মাদার* ছবির 'চল হে বন্ধু আমার' গানের জন্য পুরস্কার পাচ্ছেন। শ্রেষ্ঠ সুরকার পুরস্কারও যৌথভাবে দেওয়া হচ্ছে। *মায়া দ্য লস্ট মাদার* ছবির 'বাড়ির ওই পূর্বধারে' গানের জন্য প্লাবন কোরেশী (আবদুল কাদির) ও একই ছবির 'আমার মায়ের আঁচল' গানের জন্য সৈয়দ মো. তানভীর তারেক পুরস্কার পাচ্ছেন। *মায়া দ্য লস্ট মাদার* ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হচ্ছেন মাসুদ পথিক। *ন ডরাই*-এর জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হচ্ছেন মাহবুব উর রহমান। শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা হয়েছেন জাকির হোসেন রাজু *মনের মতো মানুষ পাইলাম না* ছবির জন্য। শ্রেষ্ঠ সম্পাদক পুরস্কার পাচ্ছেন *মায়া দ্য লস্ট মাদার* ছবির জন্য জুনায়েদ আহমদ হালিম। যুগ্মভাবে *মনের মতো মানুষ পাইলাম না* ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক পুরস্কার পাচ্ছেন মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ বাসু ও মো. ফরিদ আহমেদ। *ন ডরাই* ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক সুমন কুমার সরকার পুরস্কার পাচ্ছেন। একই ছবির জন্য রিপন নাথ শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক পুরস্কার পাচ্ছেন। *ফাগুন হাওয়ায়* ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ

পোশাক ও সাজসজ্জা পুরস্কার পাচ্ছেন খোন্দকার সাজিয়া আফরিন। শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান পুরস্কার পাচ্ছেন মো. রাজু *মায়া দ্য লস্ট মাদার* ছবির জন্য। এছাড়া শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যচিত্র হয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের *যা ছিল অন্ধকারে* এবং শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য হয়েছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের *নারী জীবন*।

প্রতিবেদন: মিতা খান

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে

নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন একজন ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার, একাধারে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতাও। তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বলে গণ্য করা হয়। এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের ৭২ তম জন্মদিন উপলক্ষে ১২ই নভেম্বর এক আয়োজনে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব 'বাকের ভাই' খ্যাত অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন, তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক, এই জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে অনেকগুলো কারণ। সেগুলো আসলে বিশ্লেষণ করা দরকার।

হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর নেত্রকোনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দীর্ঘ চার দশকের সাহিত্য জীবনে ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কারে। এর মধ্যে একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও বাচসাস পুরস্কারসহ আরো অনেক পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকতে তাঁর জন্মদিনে মুখরিত থাকত দক্ষিণা হাওয়া, নুহাশ পল্লি। তিনি ২০১২ সালের ১৯শে জুলাই চলে যান না ফেরার দেশে।

মীর মশাররফ হোসেনের ১৭৩ তম জন্মদিন

কালজয়ী ঔপন্যাসিক *বিষাদ সিন্ধুর* রচয়িতা কথাসাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের ১৭৩তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় ১৩ই নভেম্বর। ১৮৪৭ সালের ১৩ই নভেম্বর কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মে নেন তিনি। তাঁর নিজ জেলা রাজবাড়ির বালিয়াকান্দিতে নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করে বাংলা একাডেমি ও জেলা প্রশাসক। এদিন মীর মশাররফ হোসেনের সমাধিস্থলে বাংলা একাডেমি ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. সারোয়ার সালেহীন। করোনার কারণে এবছর সীমিত আকারে জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় বলে জানান বাংলা একাডেমির প্রোগ্রাম অফিসার শেখ ফয়সাল আমীন।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন মাদক 'আইস'

নতুন মাদক 'আইস', রাসায়নিক নাম মেথাম ফিটামিন। দামি এই মাদক উৎপাদন হয় অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও চীনে।

১০ গ্রাম আইসের দাম ১ লাখ টাকা। এটি সেবনে হরমোনজনিত উত্তেজনা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ হাজার গুণ বাড়তে পারে। আইস ইয়াবার চেয়ে অন্তত ৫০ গুণ বেশি ক্ষতিকর বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞরা। 'আইস' সম্পর্কে জানাতে ৫ই নভেম্বর ডিএমপি'র মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার একেএম হাফিজ আক্তার বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে নতুন এই মাদকের নাম শুনে আসছিল গোয়েন্দা পুলিশ। এ বিষয়ে তথ্য পাওয়ার পর রাজধানীতে অভিযান চালায় পুলিশ। গ্রেপ্তার করে ৬ জনকে। অবশ্যই এটা দেহ ও মনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক ড্রাগ। এটা এতই দামি যে, এর প্রতি ১০ গ্রাম ১ লাখ টাকায় বিক্রি করে মাদক ব্যবসায়ীরা।

মাদক নেওয়ার প্রমাণ মিললে পুলিশ সদস্যদের শাস্তি হবে

মাদকে জড়ালে কারও ছাড় নেই। পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ করে এই সতর্কবার্তা দিয়েছেন রাজশাহী নগর পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক। ৮ই নভেম্বর আরএমপি'র পুলিশ লাইন মাঠে মাস্টার প্যারেড পরিদর্শনে গিয়ে আরএমপি কমিশনার বলেন, ডোপ টেস্টের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সন্দেহজনক মনে হলেই টেস্ট করা হবে। মাদক নেওয়ার প্রমাণ মিললে শাস্তি হবে। মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলেও ছাড় দেওয়া হবে না। আরএমপি কমিশনার আরো বলেন, পুলিশ হবে জনবান্ধব। প্রধানমন্ত্রী বারবার সেই নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন। কাজেই আমাদের তাঁর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

সারা দেশে মাদক নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনে নামছে নারকোটিক্স

মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (নারকোটিক্স)। এ বিষয়ে ১২ই নভেম্বর সংশ্লিষ্টদের কড়া নির্দেশনা দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আহসানুল জব্বার অনলাইনে জরুরি মিটিং আহ্বান করেন। ওই মিটিং থেকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ১৩ই নভেম্বর থেকে এ অভিযান শুরু হয়। কোথাও কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে লাইসেন্স বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাঁড়াশি অভিযান মহাপরিচালক নিজেই মনিটরিং করবেন। নারকোটিক্সের একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে ।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং ১লা নভেম্বর বান্দরবান পৌর এলাকার কালঘাটা ও বনরুপা পাড়া এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ১৪টি উন্নয়ন

কঠিন চীবর দানোৎসবে রাখাইন সম্প্রদায়

‘শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম’

বৃদ্ধ পিতা–মাতাকে অবহেলা নয় সময় দিন

পিআইডি

কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্‌বোধন করেন। মন্ত্রী বলেন, এসব উন্নয়ন বাস্তবায়িত হলে বান্দরবান পৌর এলাকার ২টি ওয়ার্ডের চিত্র আরো পালটে যাবে এবং এই উন্নয়নের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান । ইউজিআইআইপি ৩ এর আওতায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে বান্দরবান পৌরসভার ২টি ওয়ার্ডে। এই উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে– পাকা সড়ক, আরসিসি ড্রেন, আরসিসি সিঁড়ি, আরসিসি রি-টেইনিং ওয়াল এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট উন্নয়ন। বান্দরবান পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, বান্দরবান পৌরসভার উদ্যোগে পৌর এলাকার ৯টি ওয়ার্ডে ইউজিআই-আইপি-৩-এর আওতায় প্রায় ৩০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার মোট ৪৫টি উন্নয়ন কাজের প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ।

বান্দরবানের চা চাষিদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে চা বোর্ড

‘বান্দরবানে চা চাষে এগিয়ে আসুন, জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখুন’– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষক-শিক্ষিত-বেকার সমাজকে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনমান উন্নয়নে ও বেকারত্ব দূরীকরণে চা চাষ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪ঠা নভেম্বর দিনব্যাপী বান্দরবান হ্লাপাইমুখ চা প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সিএইচটি প্রকল্প বান্দরবান জেলা চা বোর্ডের আয়োজনে কৃষকদের এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সিএসটি প্রকল্প পরিচালক বান্দরবান জেলা চা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুমন শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রুমা উপজেলার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষি তথ্যবিদ মো. ইমরান হোসেন, মাঠ সহকারী মেহেদী হাসান জয়, কোষাধ্যক্ষ নজরুল ইসলামসহ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

বান্দরবানে কঠিন চীবর দানোৎসব শুরু

বান্দরবানে দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব শুরু হয়েছে। ৬ই নভেম্বর বান্দরবান সদরের পারাহিতা সংঘরাজিতা বৌদ্ধ বিহারের তিন দিনব্যাপী কঠিন চীবর দানোৎসব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারের শতাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু অংশ নেন। এতে ধর্মদেশনা প্রদান করেন বান্দরবানের রোয়াংছড়ি কেন্দ্রীয় জেতবন বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ সংঘনায়ক ভদন্ত উঃ উইচারিন্দা মহাথেরো।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

যৌন সহিংসতা বন্ধে পাঠ্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিদপ্তর শিক্ষা

যৌন সহিংসতা বন্ধে কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ১০ই নভেম্বর বাংলাদেশ নারী প্রগাত সংঘ (বিএনপিএস) আয়োজিত ‘যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় শিক্ষাক্রমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা’ শীর্ষক এক ওয়েবিনারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএনপিএস-এর নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর।

অনুষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য (কারিকুলাম) অধ্যাপক মশিউজ্জামান বলেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলছে।

সরকার করোনাকালে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে গ্রহণ করেছে নানা পদক্ষেপ। মোবাইলের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত শিক্ষার্থী

সরকারের এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদানে সর্বোচ্চ সদিচ্ছা রয়েছে। ২০২১ সালের নতুন পাঠ্যক্রমে এর প্রতিফলন ঘটবে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার শিক্ষা বিষয়ে সবাই নীতিগতভাবে একমত বলে জানান পিএসটিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার আছে। এসডিজিতেও নির্দেশনা আছে। তাছাড়া বিভিন্ন নীতি,

কৌশল ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা রয়েছে। এগুলোকে সমন্বয় করতে হবে। তবে এ শিক্ষা বয়সভিত্তিক হওয়া উচিত বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারপারসন ড. মোহাম্মদ মঈনুল হোসেন।

জন্মের পরই শিশুদের হাতে ইউআইডি নম্বর

জন্মের পরই এদেশের প্রতিটি শিশু পাবে ১০ ডিজিটের পরিচিতি নম্বর। এই পরিচিতি নম্বরকে বলা হচ্ছে ইউনিক আইডি বা ইউআইডি। এটি হবে একইসঙ্গে জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয় বা এনআইডি, পাসপোর্ট, করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টসহ আরো প্রয়োজনীয় বিষয়ের নম্বর। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই একটি নম্বরে চিহ্নিত হবেন দেশের একজন নাগরিক। তাকে আর একাধিক নম্বর মনে রাখতে হবে না। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে এই কার্যক্রম শুরু হবে। ওই ইউনিক আইডি নম্বর বহাল রেখেই একটি শিশুর ১০ বছর পূর্ণ হলেই তাকে এনআইডি কার্ড দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ২২শে নভেম্বর সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এক বছর ধরে এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তুতি চলছে। আমরা এখন প্রস্তুত। আশা করছি নতুন বছরের শুরুর দিন থেকেই ইউনিক

আইডির কাজ শুরু হয়ে যাবে।

আগের রোল নম্বরেই পরবর্তী ক্লাসে উঠবে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে পরীক্ষা ছাড়াই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরও মূল্যায়ন করবেন শিক্ষকেরা। এ বছর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে মূল্যায়নের কাজ শেষ হবে। এর মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীই পরীক্ষা ছাড়াই উপরের শ্রেণিতে উঠবে। আর উপরের শ্রেণিতে ওঠার পর তাদের রোল নম্বর আগের ক্লাসের রোল নম্বরই থাকবে। তবে কোনো অভিভাবক চাইলে তার সন্তানকে আগের শ্রেণিতেও রাখার সুযোগ পাবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম ২৩শে নভেম্বর এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মূল্যায়নের বিষয়টি শিক্ষকদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এই মূল্যায়নে কোনো পরীক্ষা হবে না।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধী পরিবারের তিন সদস্য পেলেন প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড

দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে এক প্রতিবন্ধী পরিবারের তিন সদস্যকে প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিমল কুমার সরকার তাদের হাতে ভাতার কার্ড তুলে দেন। ২রা নভেম্বর প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী এ খবর জানা যায়। এর আগে প্রতিবন্ধী পরিবারটি নিয়ে গণমাধ্যমে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনের নজরে আসে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউএনও পরিমল কুমার সরকার গণমাধ্যমে বলেন, বিষয়টি জানার পর স্থানীয় সংসদ সদস্য এমপি শিবলী সাদিক মহোদয়ের বিশেষ বরাদ্দ থেকে ওই পরিবারটির তিন সদস্যকে প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় আনা হয়। তিনি আরো বলেন, পরিবারটি এখন থেকে সারাজীবন প্রতিমাসে ৭৫০ টাকা করে পাবেন। সরকারি বরাদ্দ পেলে তাদের একটি বাড়িও প্রদান করা হবে।

ভর্তিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা সংরক্ষণে ইউজিসি'র আহ্বান

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আইনানুযায়ী ন্যায্য হারে কোটা সংরক্ষণ করতে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ বিষয়ে ৫ই নভেম্বর ইউজিসি দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে চিঠি দিয়েছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়। সম্প্রতি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী তথ্য অধিকার বিধিমালা অনুসারে এ বিষয়ে তথ্য চেয়ে ইউজিসিতে আবেদন করেন। এছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আগে ইউজিসি'র চেয়ারম্যানকে এ বিষয়ে চিঠি প্রেরণ করে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩'- এর গেজেট প্রকাশিত হয়। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ন্যায্য ও কার্যকরভাবে কোটা সংরক্ষণ এবং প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রণয়নের কথা বলা রয়েছে।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

নেপালকে হারাল বাংলাদেশ

১৩ই নভেম্বর বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ দেখতে করোনা ভাইরাস ভীতিকে পাশ কাটিয়ে আট হাজারের ওপর দর্শক উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে। ২-০ গোলের জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উৎসব-উচ্ছ্বাস করতে করতে বাড়ি ফিরেছেন বাংলাদেশি খেলোয়াররা। নেপালের বিপক্ষে জয় দিয়ে বাংলাদেশ শুধু আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরেনি, একইসঙ্গে ২০১৮ সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে হারের প্রতিশোধও নিয়েছে। তার ওপর দীর্ঘ পাঁচ বছর পর 'হিমালয় দুহিতা' নেপালের বিপক্ষে জয়ের স্বাদ নিল। ২০১৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে শেষবারের মতো ১-০ গোলে জিতেছিল বাংলাদেশ। এ জয়ে ফুটবলারদের নগদ ১০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে বাফুফে।

৩৭৬ দিন পরে হোম অব ক্রিকেটে সাকিব

'৯ই নভেম্বর' তারিখটা সাকিব আল হাসানের ক্রিকেট জীবনের ক্যালেন্ডারে স্মরণীয় দিন হয়ে গেল! মিরপুর শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রতিটি কোণা তার ক্রিকেট কীর্তিতে ভাস্বর। এই হোম অব ক্রিকেটে হেসেছেন। কেঁদেছেন। আনন্দে ভেসেছেন। আবার তার কষ্টের এবং নষ্ট সময়ের কান্নাও দেখেছে বিশ্ব। এই মাঠে খেলা তো বটেই, অন্য অনেক উপলক্ষ নিয়েও এসেছেন তিনি। তবে ৯ই নভেম্বরের আসাটা একটু অন্যরকম।

ক্রিকেট জুয়াড়ির কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবের বিষয়টি গোপন রাখায় আইসিসি সাকিবকে একবছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেটে নিষিদ্ধ করে। খেলা তো বটেই, এই সময়ে আইসিসি'র খেলা হয় এমন কোনো ক্রিকেট স্থাপনায়ও সাকিবের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়েছে ২৯শে অক্টোবর। সাকিব এখন মুক্ত। নিষেধাজ্ঞা মুক্ত সেই সাকিব ৯ই নভেম্বর, মাঠে ফিরলেন। ২০১৯-এর ২৯শে অক্টোবরের পর ২০২০-এর ৯ই নভেম্বর। ক্যালেন্ডারের এই হিসাব জানাচ্ছে সবমিলিয়ে ৩৭৬ দিন পরে সাকিব ফিরলেন হোম অব ক্রিকেটে।

আইসিসি ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে সাকিব

যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরার বিমানেই হয়ত সুখবর পেয়ে গেছেন সাকিব আল হাসান। তার এক বছরের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর

৪ঠা নভেম্বর ওয়ানডের নতুন র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে আইসিসি। তাতে অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ে সিংহাসনেই আছেন সাকিব। এই এক বছরে ওডিআইতে তাকে টপকাতে পারেননি আর কোনো অলরাউন্ডার। তার রেটিং পয়েন্ট কিছুটা কমে ৩৭৩। তার চেয়ে ৭২ রেটিং পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবী (৩০১ রেটিং) রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে।

আধুনিক হচ্ছে রংপুর ক্রিকেট গার্ডেন

রংপুরের কালেক্টরেট ক্রিকেট গার্ডেনকে জাতীয় পর্যায়ের খেলার উপযোগী হিসেবে করতে অবকাঠামো ও সার্বিক উন্নয়নকল্পে মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ

ক্রিকেট বোর্ডে ও রংপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে দশ বছরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির প্রথম কার্যক্রম হিসেবে ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে ক্রিকেট গার্ডেনে গ্রিল ফেন্সিং নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

৭ই নভেম্বর রংপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি আসিব আহসান আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রিল ফেন্সিং নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন। উল্লেখ্য, রংপুর কালেক্টরেট ক্রিকেট গার্ডেন বাংলাদেশের একমাত্র মাঠ যেখানে ক্রিকেটের অনুশীলন ও খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭৪ দেশকে হারিয়ে রোবটিকসে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা ফার্স্ট গ্লোবাল আয়োজিত আন্তর্জাতিক রোবটিকস প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ১৭৪টি দেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের একটি দল। ৩১শে অক্টোবর রাতে অনলাইনে প্রতিযোগিতাটির সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। বিজয়ী দলের সদস্যরা হলো– সুজয় মাহমুদ, রাজিন আলী, মাহি জারিফ, শাহরিয়ার সীমান্ত, আবরার জাওয়াদ, আয়মান রহমান, বিয়াঙ্কা হাসান, আরিবা নাওয়ার আনোয়ার, ফাইরুজ হাফিজ ফারিন ও জাহরা চৌধুরী। সবাই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। পড়াশোনার পাশাপাশি রাজধানীর দ্য টেক একাডেমিতে রোবটিকস ও প্রোগ্রামিং শেখে তারা। ১লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল এবারের প্রতিযোগিতা। ১২ সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজনে ছিল তিনটি ধাপ– টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জ, সোশ্যাল মিডিয়া চ্যালেঞ্জ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। তিন ধাপ মিলিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ মোট ১১৭ পয়েন্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দেশ চিলি ও আলজেরিয়ার পয়েন্ট যথাক্রমে ১১৫ ও ১১২।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

চলে গেলেন অভিনেতা, নির্দেশক আলী যাকের

আফরোজা রুমা

অভিনেতা, নির্দেশক আলী যাকের চলে গেলেন না ফেরার দেশে। আলী যাকের দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৭শে নভেম্বর ভোর ৬টা ৪০ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৯৪৪ সালের ৬ই নভেম্বর চট্টগ্রামের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক মোহাম্মদ তাহের ও তাঁর স্ত্রী রিজিয়া তাহেরের ঘরে আলী যাকের যখন জন্ম নিলেন, চারপাশে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। চট্টগ্রামে জন্ম হলেও আলী যাকেরের পৈতৃক নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে। বাবা মোহাম্মদ তাহেরের বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের চাকরির সুবাদে ছেলেবেলায় এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন আলী যাকের। ফেনী, খুলনা, কুষ্টিয়া ঘুরে বাবা যখন প্রাদেশিক সরকারের সচিব হলেন, তখন আলী যাকেরের পরিবার থিতু হয় ঢাকায়। সেন্ট গ্রেগরি থেকে ম্যাট্রিক এবং নটরডেম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট করে আলী যাকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই জড়িয়ে পড়েন নাট্যচর্চায়, সেই সঙ্গে ছাত্র রাজনীতিতে। আলী যাকের তখন ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। ছাত্র ইউনিয়ন মস্কোপন্থি ও পিকিংপন্থি দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেলে তিনি মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে মস্কোপন্থি ছাত্র ইউনিয়নে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে করাচিতে যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা ডব্লিউ এস ক্রফোর্ডাসে ট্রেইনিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে আলী যাকের কর্মজীবন শুরু করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তিনি এশিয়াটিকের দায়িত্ব নেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কোম্পানির গ্রুপ চেয়ারম্যান ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আলী যাকের প্রথমে ভারতে গিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাংবাদিক আলমগীর কবির তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন প্রচারযুদ্ধে অংশ নিতে। আলী যাকের যুক্ত হন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে।

স্বাধীন দেশে ফেরার পর ব্যস্ত হন এশিয়াটিক সোসাইটিকে দাঁড় করানোর কাজে। অভিনেতা, নির্দেশক মামুনুর রশীদের সঙ্গে তখন তাঁর দারুণ বন্ধুত্ব। সেই সূত্র ধরেই ১৯৭২ সালে আরণ্যকের 'কবর' নাটকে অভিনয় করেন আলী যাকের, শুরু হয় মঞ্চে তাঁর পথচলা। 'অচলায়তন', 'বাকী ইতিহাস', 'সৎ মানুষের খোঁজে', 'তৈল সংকট', 'এই নিষিদ্ধ পল্লীতে', 'কোপেনিকের ক্যাপ্টেন'সহ বেশ কয়েকটি মঞ্চ নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন আলী যাকের। বেতারে অর্ধশতাধিক শ্রুতি নাটকেও কাজ করেছেন তিনি। আলী যাকের *আগামী (১৯৮৬)*, *নদীর নাম মধুমতী (১৯৯৬)*, *লালসালু (২০০১)* এবং *রাবেয়া (২০০৮)* চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। অভিনয়, নির্দেশনার বাইরে তিনি ছিলেন একজন নাট্য সংগঠক, পাশাপাশি যুক্ত ছিলেন লেখালেখির সঙ্গে। নাটকে অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে সরকার তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করে। এছাড়া দীর্ঘ কর্মজীবনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী পদক, নরেন বিশ্বাস পদক, অভিনয়ের জন্য দ্য ডেইলি স্টার-স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড সেলিব্রেটিং লাইফ (২০১৮) এবং মেরিল প্রথম আলো আজীবন সম্মাননা পুরস্কার(২০১৯) অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি আলী যাকের যুক্তরাজ্যের রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটিরও সদস্য ছিলেন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত এই নাট্যজনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। আলী যাকেরের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে। একাত্তরের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এই শব্দসৈনিককে সেখানে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আলী যাকেরের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বনানী কবরস্থানে। সেখানে বাদ আসর কবরস্থান মসজিদে জানাজার পর তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 06, December 2020, Tk. 25.00

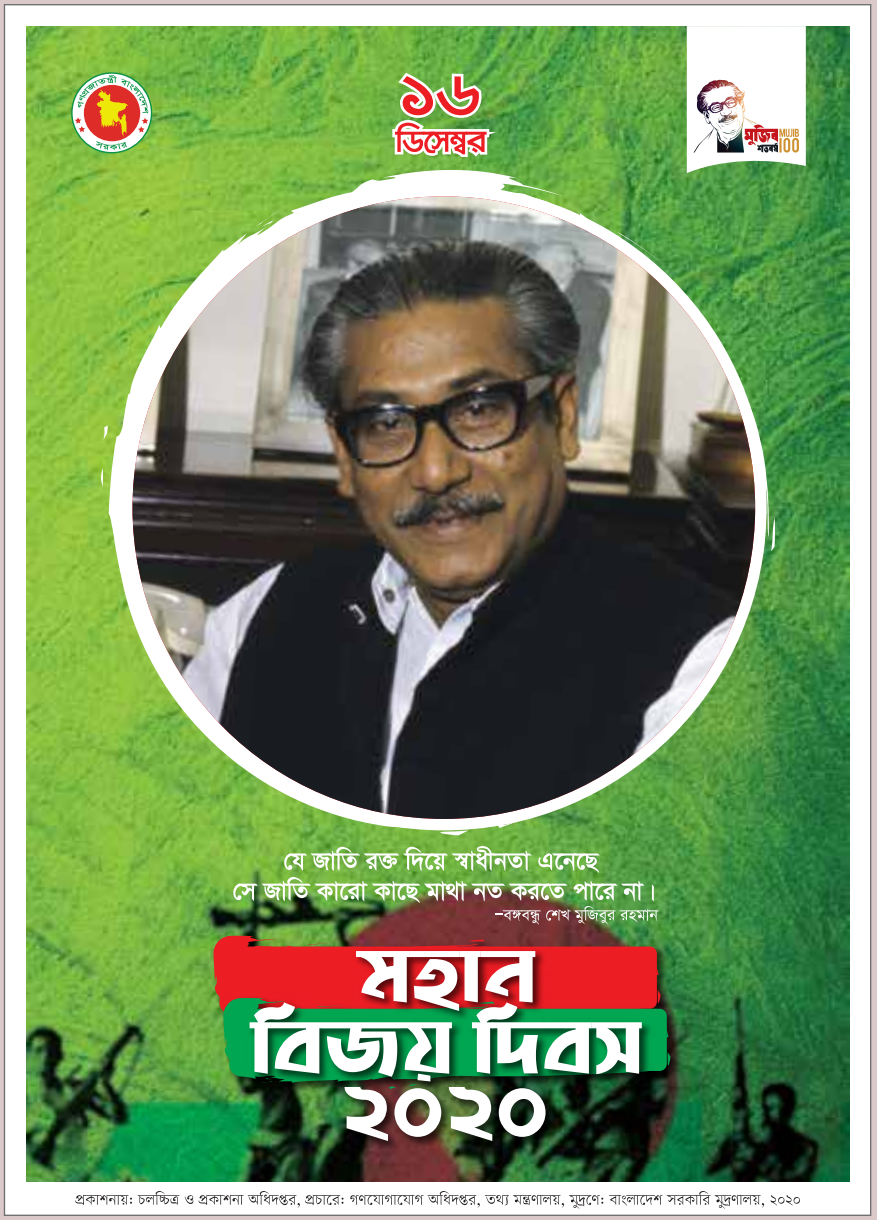

প্রকাশনায়: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, প্রচারে: গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, মুদ্রণে: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ২০২০

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd